অহল্যা উপাখ্যান

অর্থাৎ

হিন্দুজাতির পতনের কারণ ও তাহার পুনরুত্থানের উপায়

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রভুদত্ত শাস্ত্রী অগ্নিহোত্রী
মহোদয়কৃত ভূমিকা সম্বলিত।

শ্রীযোগিরাজশিষ্য মৈত্রেয়
প্রণীত

"সর্ব্ববাদিসম্মতধর্ম্ম" হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত।

শকাব্দা ১৮৪৮।

[মূল্য এক টাকা মাত্র
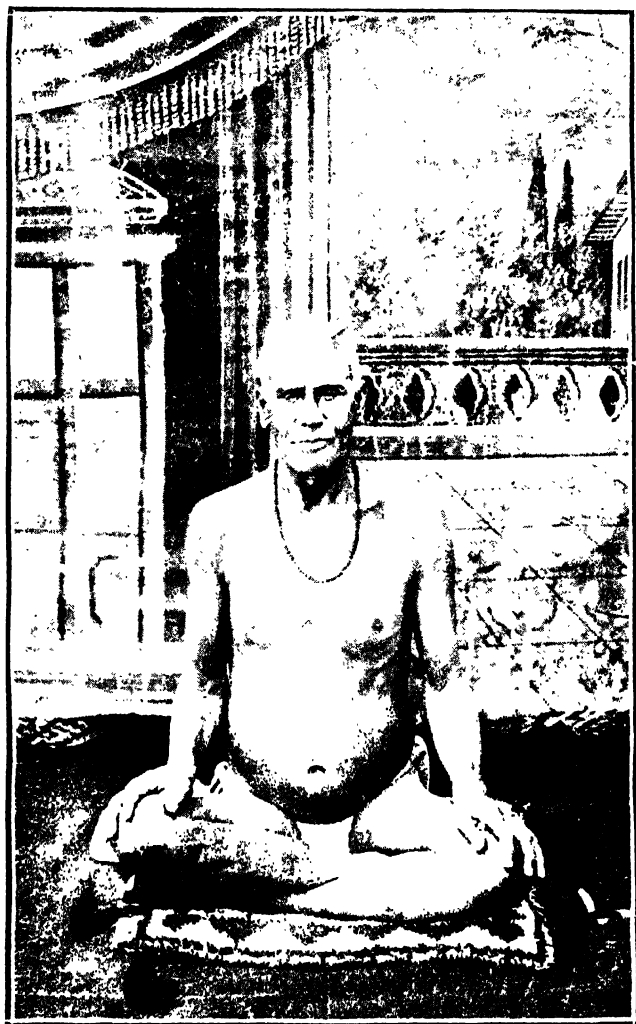
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণদয়ালুগিরি বুদ্ধগয়াধীশ্বরমহারাজ

(সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক)

উৎসর্গ।

ইদং নম ঋষিভ্যঃ
পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ।

যাঁহারা মনুষ্যদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া তাহাদের স্বর্গগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই পূর্ব্ব-ঋষিদিগের চরণে নমস্কার। (ঋগ্বেদ—১০-১৪-১৫)।

এই পুস্তকোল্লিখিত বিষয় রাজরাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী **মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীনরেশ** মহোদয়ের রামনগর দুর্গস্থ রাজসভায় সাদরে অনুমোদিত হইয়াছে, এবং নিখিল ভারতবর্ষের পরিব্রাজকসন্ন্যাসি মহামণ্ডল এবং সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গ ও ক্ষত্রিয়রাজাদিগের সম্মতি লাভ করিয়াছে।

"বুদ্ধগয়াতীর্থগুরু যোগিরাজের কার্য্য সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করুক ইহা আমার প্রার্থনা।" (মিথিলাধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীরামেশ্বর সিংহ বাহাদুর।)

"পরিচালকদিগের মধ্যে আমিও একজন থাকিতে ইচ্ছা করি।" (গৃধ্রকূটাধিপতি মহারাজা শ্রীরাবণেশ্বর-প্রসাদ সিংহ বাহাদুর।)

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্।" (ঋগ্বেদ—১-১-১)।

ভূমিকা।

প্রদীপদান, আরতি ও হোম প্রভৃতি দেবকর্ম্মে ঘৃত পবিত্র না হইলে হিন্দুর পূজা পণ্ড হয়। ঐরূপ পূজা দ্বারা দেবতা সন্তুষ্ট হন না; উহাতে সুফল না হইয়া কুফলই হইয়া থাকে। অধুনা অপবিত্র অর্থাৎ চর্ব্বি-মিশ্রিত ঘৃত ব্যতীত অন্য ঘৃত ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং যাহাতে দেবকর্ম্মের নিমিত্ত পবিত্র ঘৃত পাওয়া যাইতে পারে তাহার আয়োজন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। হিন্দুগণকে এই শ্রেষ্ঠকর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই এই গ্রন্থপ্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। "শং নো অগ্নিঃ।"

শ্রীপ্রভুদত্তশাস্ত্রী অগ্নিহোত্রী।

(কাশী)।

অহল্যা উপাখ্যানের

বিষয়সূচী।

অহল্যা উপাখ্যান।

অবতরণিকা।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম।

যোগবাসিষ্ঠ নামক গ্রন্থে এইরূপ কথিত আছে। মগধদেশে অহল্যানাম্নী কোন এক যুবতী রমণী স্বীয় ভর্ত্তার সহিত পরমসুখে বাস করিত। সেই দেশেই আবার ইন্দ্রনামে এক যুবক বিপ্রতনয় বাস করিত। একদা পুরাণকথা (কথকতা) শ্রবণ করিতে গিয়া সেই অহল্যা শ্রবণ করিল যে 'পূর্ব্বে গৌতমপত্নী অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্রের অভিলষিত হইয়াছিলেন'। এই কথা শ্রবণ করিবার পর হইতে সেই অহল্যার শান্তচিত্তে কোথা হইতে দুর্নিবার চিন্তারাশি আসিয়া উপস্থিত হইল। 'আমি অহল্যা, কবে আমার ইন্দ্রের অভিলষিত হইব,' এই

প্রকার ভাবনার বশীভূত হইয়া অহল্যার চিত্ত সেই যুবক ইন্দ্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কালে সেই যুবকের প্রতি অহল্যা এত অনুরক্ত হইল যে, এই জগৎ কেবল তন্ময়ই দেখিতে লাগিল। নিখিল গুণাধার হইলেও স্বীয় ভর্ত্তা আর তখন তাহার প্রীতিকর হয় নাই। অনন্তর সুযোগক্রমে অহল্যা সেই বিপ্রতনয় ইন্দ্রকে স্বীয় প্রেম নিবেদন করিল। সেই ইন্দ্রেরও তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ তাহাতেই আসক্ত হইল, সে ক্ষণকালও তাহার বিরহে অবস্থান করিতে পারিত না। অনন্তর যখন তাহারা গাঢ়প্রণয়বশতঃ প্রকাশ্য ভাবেই পাপ কর্ম্মে রত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের ঐ দুঃসহ জঘন্য ব্যাপার অহল্যার ভর্ত্তার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি কিন্তু অহল্যাকে স্বীয় মানসাকাশের চন্দ্রমা সমান জানিতেন এবং ভার্য্যাতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এই নিদারুণ ব্যাপার শ্রবণে তিনি মর্ম্মাহত হইয়া উভয়ের প্রতি রাজশাসন অনুসারে বধদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ অবধ্যকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও তদ্রূপ পাপ হইয়া থাকে। অনন্তর গাঢ়স্নেহে আবদ্ধচিত্ত ঐ অহল্যা ও ইন্দ্র বধদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বৃক্ষচ্যুত পল্লবের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। পাপের সমুচিত দণ্ড হইল বটে; কিন্তু একটি শান্তিময় পরিবার দুঃখময় হইয়া রহিল

এবং কতকগুলি মানবের জীবন পাপে কলুষিত হইয়া গেল। (যোগবাসিষ্ঠমহারামায়ণ, উৎপত্তিপ্রকরণ, ৮৯-৯০ অধ্যায়)।

অনেকে বলিতে চান যে পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ ধর্ম্মবিস্তারের এবং ধর্ম্মপ্রবাহ রক্ষার জন্য বিশেষ উপকারী,—উহাদিগ হইতে অধর্ম্মের প্রসার লাভ করিবার কোনই আশঙ্কা নাই। কিন্তু যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের উক্ত আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অহল্যার উপাখ্যান জনসমাজের পক্ষে হিতকারী না হইয়া অনিষ্টকারীই হইয়াছে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ পৌরাণিক উপাখ্যান সম্বন্ধে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে রামায়ণ পাঠ করিয়া রামের চরিত্রের অনুকরণ করে না, কিন্তু রাবণের চরিত্রেরই অনুকরণ করে; মহাভারত পাঠ করিয়া কৃষ্ণের চরিত্রের অনুকরণ করে না, কিন্তু দুর্য্যোধনের চরিত্রেরই অনুকরণ করে। যে কালে যোগবাসিষ্ঠ রচিত হইয়াছিল, সে কালে ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল; যদি সেই কালেই পৌরাণিক উপাখ্যানসমূহ হইতে সমাজের অহিত হইত, তাহা হইলে একালে—যখন ধর্ম্মের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে তখন—উহাদিগ হইতে যে প্রভূত অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গল্পকথা।

ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি গৌতম মুনির ছাত্র ছিলেন এবং প্রত্যহ "কাঁকে পুথি" লইয়া স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিতেন। গৌতম মুনির পত্নীর নাম ছিল অহল্যা। অহল্যার রূপে মোহিত হইয়া ইন্দ্র একদিন গৌতম মুনির ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে আগমন করিয়া অহল্যাকে প্রতারিত করেন এবং অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। গৌতম মুনি পশ্চাৎ ইহা অবগত হন এবং গুরুপত্নী হরণের অপরাধে ইন্দ্রকে যে শাপ দেন তাহার ফলে ইন্দ্র সহস্রটি চক্ষু পুরস্কার পাইয়াছিলেন। অহল্যা লজ্জায় জড়সড় হইয়া তখনই একটি পাষাণখণ্ডে পরিণত হইয়া যান, পশ্চাৎ রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পুনরায় মনুষ্যজীবন লাভ করেন। (মূল রামায়ণে উক্ত আছে যে, অহল্যা ইন্দ্রের ছদ্মবেশ জানিতে পারিয়াও, ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রতারিত হইয়াছিলেন)।

এই গল্পটি কি প্রকারে কোন্ সময়ে ও কি কারণে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। এই গল্পের মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে বিচার করিতে হইবে। কারণ, হিন্দুজাতি এই গল্পকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেবল

বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গে পরিণত করিয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরক্ষণেই অহল্যার নাম স্মরণ করা প্রতি-দিবসের প্রথম ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। (নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে "অহল্যা পাষাণী" দর্শন করা হিন্দুর পক্ষে মহাপুণ্যজনক কর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করার ফলে হিন্দুরা ইহা স্থির করিয়া লইয়াছে যে, সত্যই সেই স্থানেই অহল্যা ও গৌতম মুনি বাস করিতেন, ও ইন্দ্র আগমন করিয়াছিলেন, এবং পশ্চাৎ রামচন্দ্র পাষাণীকে পাদস্পর্শ দ্বারা পূর্ব্ব অবস্থায় পরিণত করিয়া-ছিলেন। এই শ্রেণীর গল্পকে ধর্ম্মে পরিণত করার ফল কদাচ ভাল হইতে পারে না; এ বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠের উক্ত প্রাচীন আখ্যায়িকা প্রমাণ। ইদানীন্তন কালে হুমায়ুন নামক যবনরাজের সময়ে যে মুসলমান ব্যক্তি অহল্যা হড়িকা নাম্নী কোন হিন্দু রমণীকে হরণ করিয়া-ছিল, সেই ব্যক্তিও অহল্যা উপাখ্যানের দোষ দিয়া রাজার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিল।

সত্যকথা।

বেদে ইন্দ্রকে "অহল্যাজার" বলা হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু গৌতম মুনির ও মুনিপত্নী অহল্যার জন্মের বহুকাল

পূর্ব্বে উহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহা গৌতমপত্নী অহল্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই।

"অহল্যায়ৈ জার" ইতি (ইন্দ্রসম্বোধনম্)।—শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৩-৩-৪-১৮; তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১-১২-৪; লাট্টায়ন শ্রৌতসূত্র, ১-৩-১; ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ, ১-১॥

উক্ত বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া আচার্য্য কুমারিলভট্ট যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ॥"

এই ব্যাখ্যার অনুবাদ করিয়া ভট্ট মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—

"If it is said that Indra was the seducer of Ahalya, this does not imply that the god Indra committed such a crime; but Indra means the sun, and Ahalyá (from *ahan* and *li*) the night; and, as the night is seduced and ruined by the sun of the morning, therefore is Indra called the paramour of Ahalyá." (Max Muller: History of Ancient Sanskrit Literature, 2nd Edition, p. 529-530).

অহঃ (অহন্) শব্দের অর্থ দিন। অহোরাত্র, অহরহঃ, মধ্যাহ্ন ইত্যাদি শব্দে দিন-অর্থবোধক অহঃ শব্দ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি। "অহনি লীয়তে, ইতি অহল্যা"। অহনি অর্থাৎ দিবসে, লীয়তে অর্থাৎ বিলীন হইয়া যায়, লয় পায়, এই জন্য রাত্রিকে অহল্যা বলে। যাহাকে আমরা 'দিন ও যামিনী' বলি বেদে তাহাকেই 'অহঃ ও অহল্যা' বলে। রাত্রির ধর্ম্ম অন্ধকার। সূর্য্যোদয় হইলে সেই অন্ধকার সূর্য্যের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া যায়, এই হেতু সূর্য্যকে রাত্রির পতি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্যের নিকটে আলোক প্রাপ্ত হইয়া, সেই আলোক দ্বারা রাত্রির অন্ধকার দূর করে, সুতরাং উহাতেও সূর্য্যেরই পতিত্ব রহিয়াছে। "আদিত্যেন চন্দ্রমা ভাতি" এই বাক্য বেদে আছে। (শঙ্করাচার্য্যকৃত শতশ্লোকীর ৫৩ শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য)। পরন্তু বিদ্যুৎ-বিষয়ে প্রভেদ আছে। বিদ্যুৎ সূর্য্যের অনুপস্থিতিকালে ও তাহার অজ্ঞাতসারে রাত্রির ধর্ম্মকে অর্থাৎ অন্ধকারকে অকস্মাৎ নষ্ট করে, এবং তাহা করিয়াই পুনরায় পূর্ব্ববৎ লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করে। এই হেতু বিদ্যুৎকে রাত্রির জার অর্থাৎ উপপতি বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু বজ্রধারী ইন্দ্রকে বিদ্যুতের

প্রেরণকারী দেবতা বলা হয়। এই হেতু বেদে ইন্দ্রকেই রাত্রির উপপতি, "অহল্যাজার," বলা হইয়াছে। অধিকন্তু বেদে জার শব্দের অর্থ উপপতি নহে; যিনি অপর কোন বস্তুকে জীর্ণ করেন তিনি সেই বস্তুর জার বলিয়া কথিত হন। (জীর্য্যতি ইতি জারঃ)। ইন্দ্র বজ্রদ্বারা রাত্রিকে জীর্ণ করেন, অর্থাৎ বিদ্যুৎ দ্বারা রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করেন, এই হেতু তিনি "অহল্যাজার" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এই বেদবাক্যটির অর্থে কোন অশ্লীলতার লেশমাত্র নাই।

বেদে ইন্দ্র বলিলে সূর্য্যকেও বুঝায়। সূর্য্য নিজের আলোকদ্বারা অহল্যার, অর্থাৎ রাত্রির, অন্ধকার জীর্ণ করেন, অর্থাৎ নষ্ট করেন, এই হেতু সূর্য্যকেও অহল্যাজার বলা যায়। কুমারিলাচার্য্য বহুকাল পূর্ব্বে এই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুগণ ঐ ব্যাখ্যায় মনোযোগ করে না। তাহারা তাহাদিগের কুরুচিজনক কুসংস্কার-সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যকথা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুকও নহে। বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতেছেন। হিন্দুগণ তাঁহাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছে কিন্তু আপনাদিগের কুসংস্কারসমূহকে কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না। ইহা

হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের প্রকৃতিই কুরুচিসম্পন্ন, এবং গর্হিত কর্ম্মসমূহই তাহা-দিগের সুখের আদর্শ ও মনের প্রীতিকর।

ইন্দ্র দেবরাজ। ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন চিরকুমারব্রতধারী রুদ্রগণ নামক উগ্র দেবতারাও ইন্দ্রের নিকট মস্তক অবনত করেন। রূপে, গুণে ও বীর্য্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই দেবরাজ হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ইন্দ্রাণী দেবরাণী; তিনি ইন্দ্রের সমান গুণসম্পন্ন বলিয়াই ইন্দ্রের চিরসহচরী হইয়াছেন। ইন্দ্রের গুরু দেবগুরু বৃহস্পতি, কোন মনুষ্যগুরুকে তিনি স্বীয় গুরুপদে বরণ করিতে পারেন না। কারণ, মর্ত্ত্যগণের নিকটে দেবতাগণের শিক্ষালাভ করিবার কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। ইন্দ্রের ক্রতুর অর্থাৎ সৎকর্ম্মের অন্ত নাই বলিয়া তাঁহাকে বেদে শতক্রতু, সহস্রক্রতু প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানের পরিসীমা নাই বলিয়া তাঁহাকে সহস্রচক্ষু বলা হইয়াছে। তিনি গৌতমপত্নী অহল্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন এই কথা বিশ্বাস করা হিন্দুদিগের পক্ষে অত্যন্ত কুরুচির পরিচায়ক নহে কি?

যেমন কোন ব্যক্তির পত্নীর নাম যামিনী। যদি সেই ব্যক্তি চন্দ্রকে “যামিনীবল্লভ” বলিয়া সম্বোধন করে,

তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, চন্দ্র বাস্তবিকই সেই ব্যক্তির পত্নীর বল্লভ ছিল। তদ্রূপ গৌতম মুনির পত্নীর নাম ছিল অহল্যা। সেই গৌতম মুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিবার সময়ে তাঁহাকে বৈদিক মন্ত্র অনুসারে "অহল্যাজার", অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকার নাশক, বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আবার সেই মুনিরই ইন্দ্রনামক কোন রাজা শিষ্য ছিল। ইহা হইতেই এই গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র গৌতম মুনির শিষ্য হইয়া গুরুপত্নী অহল্যার জার হইয়াছিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেদ ও পুরাণ।

বেদ ও পুরাণ উভয়ই দেবতাবিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ। বেদে দেবতাদিগের চরিত্রে লম্পটতার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বেদের দেবতারা সর্ব্বদা অধর্ম্মের হস্ত হইতে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য খড়গহস্ত হইয়া আছেন; সেই হেতু তাঁহারা তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় দেবতাগণ অতি জঘন্য ব্যভিচারদোষে দুষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা হিন্দুগণ বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরাণকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং অহল্যা-জারের ন্যায় অন্যান্য বিবিধ জারের কল্পনা করিয়া স্বধর্ম্মকে কলুষিত করিতেছে এবং তৎসহিত আপনারাও পাপে লিপ্ত হইয়া তেজোহীন ও অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি (ব্রহ্ম ও মায়া, অর্থাৎ জ্ঞান ও কল্পনা) এই উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা বেদসম্মত। ঐ উভয়কে ভ্রাতা ও ভগিনী কল্পনা করিয়া

জগন্নাথদেবকে ভগিনীজার বলিয়া সম্মান করা কদাচ ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দুগণ পুরাণের প্রমাণে বলে যে ঐরূপ না বলিলে দেবতা সন্তুষ্ট হন না।

ব্রহ্ম ও মায়ার (অর্থাৎ কল্পনার) সহযোগ হইতে প্রথমে ঈশ্বর উৎপন্ন হন ; পশ্চাৎ ঈশ্বর মায়ার (কল্পনার) সাহায্যে সৃষ্টি উৎপাদন করেন। ইহা দর্শনশাস্ত্রের কথা। ইহা হইতে মহেশ্বরের মাতৃজারত্বের কথা পুরাণে লিপি-বদ্ধ করিয়া অনেক পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মা হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, আবার ব্রহ্মা সেই বেদবিদ্যাকে বরণ করিয়াছেন, তিনি অপর কোন কিছুকেই জ্ঞাতব্য মনে করেন না। এই কথা বেদসম্মত। ইহা হইতে পুরাণে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মা তাঁহার কন্যা বিদ্যারূপিণী সরস্বতীকে উৎপাদন করিয়া আবার তাহাতেই আসক্ত হইয়াছেন। হিন্দুগণ এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে ; কারণ, অদ্যাবধি তাহারা কদাচ ব্রহ্মার উপাসনা অথবা তাঁহার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করে না।

দেবতাদিগকে দেবলোক হইতে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। কারণ, দেবলোকেও দুঃখের সম্পূর্ণ অভাব হয় না ; দেবতাদেরও আধিব্যাধি হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ এই যে, দেবতাগণের মধ্যে অশ্বিনী-

কুমার নামক চিকিৎসকদ্বয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও মনুষ্যগণকে প্রথমতঃ দেবলোকে গমন করিতে হইবে; দেবত্বলাভ করিয়া পশ্চাৎ আরও অগ্রসর হইতে হইবে। মনুষ্য থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান অথবা মুক্তি লাভ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাহা করিতে হইলে "অনন্ত" বস্তুকে উপলব্ধ করা আবশ্যক হয়, যাহা মনুষ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্রজ্ঞানের মধ্যে কদাচ আসিতে পারে না। এই সকল কথা বেদসম্মত। এই সকল হইতে পুরাণকার স্থির করিলেন যে, যখন মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় দেবলোকও অনিত্য, দুঃখময় ও পাপময়, তখন মনুষ্যের দেবলোকে গমন করিবার আবশ্যকতা নাই; একবারে পরব্রহ্মে বিলীন হওয়াই শ্রেয়ঃ। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি এক নবীন মতের প্রচার করিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তিলাভ করা মনুষ্যের সাধ্য, যদ্যপি তাহা দেবতাগণের সাধ্য না হইতে পারে। হিন্দুগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই নবীন মত গ্রহণ করিয়া বৈদিক দেবযজন পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে সমগ্র হিন্দুজাতি জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বাণদশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছে। দেশকে নরকের তুল্য করিয়া নরকের কীট এখন এই নরককেই নিজের প্রকৃত বাসভূমি বলিয়া মনে করিতেছে।

বেদে দেবতা সকলকে কতকগুলি গণে বিভক্ত করা

হইয়াছে; যথা, ইন্দ্রগণ, বায়ুগণ, মিত্রগণ, আদিত্যগণ, অগ্নিগণ, রুদ্রগণ, মরুৎগণ ইত্যাদি। (ঋগ্বেদ—১-১৪-৩)। মনুষ্যদিগের দেবযজনের নিমিত্ত এই সকল দেবতাগণের অধিপতি হইতেছেন অগ্নিদেব, কারণ তিনিই দেবতাদিগকে মর্ত্ত্যলোকে যজ্ঞাগ্নির মধ্যে আনয়ন করেন। ইহাই সমুদয় বেদরূপ শব্দরাশির মুখ্য তাৎপর্য্য। (ঋগ্বেদ—১-১-২)। এই হেতু অগ্নিদেবকে গণপতি বা গণেশ বলা হয়। অগ্নিদেবের উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা ভস্ম-রাশির উপরি হস্তিশুণ্ডের সদৃশ্য শিখা উত্তোলন করে, ইহা হইতেই পুরাণে গণেশের মস্তক ভস্মীভূত হওয়ার, এবং তাঁহার নিজ মস্তকের বিনিময়ে হস্তিমস্তক লাভ করার, উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে। বেদে হোমাগ্নিকে বিঘ্ননাশন বলা হইয়াছে; পুরাণে গণেশকে বিঘ্ননাশন বলা হয়। কিন্তু দিব্যশরীরে হস্তির মস্তক ধারণ করা একটি বিষম বিঘ্ন; গণেশ অদ্যাবধি নিজের সেই বিঘ্ন দূর করিতে পারেন নাই, তিনি অন্যের বিঘ্ন কি প্রকারে নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কোন হিন্দুই ভাবিয়া দেখে না।

জ্যোতিষশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সূর্য্য বৎসরে এক মাস কাল কন্যারাশিতে গমন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে হিন্দুগণ সূর্য্যের কন্যাগমন কল্পনা করিয়া বিবিধ

কুৎসিত গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বেদ হইতে সেই সকলের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছে।

বেদে বৃত্র শব্দের অর্থ অন্ধকার। বজ্রধারী ইন্দ্র বিদ্যুৎ দ্বারা অন্ধকার নষ্ট করেন, সেই জন্য বেদে ইন্দ্রকে বৃত্রহা বলা হইয়াছে। ইহা হইতে পুরাণে বৃত্রাসুরের বধ এবং সেই প্রসঙ্গে অসুর কর্ত্তৃক ইন্দ্রাণীর হরণ পর্য্যন্ত কল্পিত হইয়াছে। পুরাণের কল্পনা অনুসারে কবি গান করিলেন, "অমর সমরক্ষেত্রে বৃত্রবধ দিনে। বরিল লাবণ্যরাণী তেজকুলরাজে॥" ইহার ফলে যে কত "লাবণ্যরাণী" নিরীহ "বৃত্রকে" গুপ্তভাবে বধ করিয়া নৃশংস "তেজকুল-রাজ"কে বরণ করিলেন,—একটি সংসারকে উৎসন্ন করিয়া দিলেন,—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বাস্তবিক দেবাসুর সংগ্রাম কখনও সংঘটিত হয় নাই; বৃত্রহা ও অহল্যাজার এই দুই শব্দের একই অর্থ।

অহল্যার উপাখ্যান একটি উদাহরণ মাত্র। সমুদায় পুরাণ এই প্রকার কুরুচির উৎপাদক ও ব্যভিচারদোষ-জনক গল্পে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই গল্প সকল মিথ্যা ও অসম্ভব। মিথ্যা, অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যের অন্যথা-করণ। অসম্ভব, অর্থাৎ পূর্ব্বে কখন হয় নাই, পরে কখন

হইবে না, এবং যখনকার কথা তখনও হইতে পারে না। অথচ হিন্দুগণ কেবল যে ঐ সমস্ত গল্পকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা নহে, পরন্তু ঐ সমস্তকেই ধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে এবং তদনুসারে মিথ্যা ক্রিয়াকর্ম্মাদির ও মিথ্যা তীর্থযাত্রাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যে সকল সত্যের দিকে দৃষ্টি করিলে এই সকল মিথ্যা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে, হিন্দুরা সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বড়ই ক্লেশ অনুভব করে। মিথ্যা ও ব্যভিচার লইয়া থাকাতেই তাহারা পরমসুখ প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে তাহাদের কল্পিত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রই উত্তম উদাহরণ।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র।

ভাগবতপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ কামার্ত্ত ও স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, মহাভারতে সেইরূপ বলিয়া বর্ণিত হন নাই। এই জন্যই কোন আধুনিক পুরাণকার ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে হরিবংশ রচনা করিয়া তাহাকেই মহাভারতের পরিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং হরিবংশ পাঠ না করা পর্য্যন্ত মহাভারতের পাঠ সম্পূর্ণ হয় না এই প্রকার শাসন করিয়া রাখিয়াছেন।

ভগবদ্গীতা ভাগবতপুরাণের কোনও অংশ নহে।

উহা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের একটি অংশ। ঐ গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

"হে অর্জ্জুন! তুমি জান যে আমার কোন বিষয়েই কামনা নাই, সুতরাং আমার কর্ম্ম করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু দেখ, তথাপি আমি সর্ব্বদা কর্ম্মে রত থাকি। যদি আমি নিরন্তর কর্ম্মে রত না থাকি, তাহা হইলে লোকসমূহ আমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া অলস হইয়া থাকিবে। কারণ, গণ্যমান্যব্যক্তি যাহা করেন বা যাহার অনুমোদন করেন, অপর সকলে তাহারই অনুকরণ করে। লোকসমূহ অলস হইলে তাহারা ব্যভিচারাদিদোষে আসক্ত হয়। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে জারজসন্তানাদির উৎপত্তি হইতে থাকে, এবং তাহারই ফলে প্রজাসমূহ উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব যদি আমি কর্ম্মত্যাগ করিয়া সকলকে আমার দৃষ্টান্ত দ্বারা আলস্যের পথে লইয়া যাই, তাহা হইলে এই সকল প্রজাদিগের মধ্যে ব্যভিচারাদিদোষ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে উৎসন্ন করার পাপ আমাকেই বহন করিতে হইবে।" (ভগবদ্গীতা—৩-২১)।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিকই লম্পট ও ব্যভিচারী হইতেন তাহা হইলে তিনি সর্ব্বসমক্ষে কখনই উক্তপ্রকার গর্ব্ব করিতে পারিতেন না। প্রত্যুত, ঐপ্রকার

গর্ব্ব করিলে, তিনি স্বয়ং ব্যভিচারের আদর্শ বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই সকলের উপহাসাস্পদ হইতেন। অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্তপ্রকার বচন দেখিতে পাওয়া যায়।

"স্ত্রীজাতির স্পর্শ আমার নিকটে বজ্রের সদৃশ দুঃসহ বলিয়া বোধ হয়"; "স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি হইতে ধীর আত্মবান্ ব্যক্তির যেরূপ ক্লেশ উপস্থিত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হয় না।"

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কলঙ্কচরিত্রবান্ আদর্শবীর-পুরুষ। সেই পার্থসারথি চক্রপাণি বীরকে কোন হিন্দুই উপাসনা করে না। কিন্তু ভাগবতের ও হরিবংশের কল্পিত, কদাচাররত, স্ত্রৈণ কৃষ্ণের চরিত্র এবং তাহার যুগলরূপ ও কামোদ্দীপকলীলাসমূহ হিন্দুদিগের পূজার বস্তু, এবং তাহাদের অনুকরণীয় হইয়া সমাজে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে হিন্দুসংসারে বাসিষ্ঠোক্ত ইন্দ্র-অহল্যার ন্যায় "রাধাকৃষ্ণের" অভিনয় যে কত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই বলা যাইতে পারে। এমন কি, কোন কন্যার নাম "রাধা" হইলে পাছে সেই কন্যা কালে আপনার পতিকে লঙ্ঘন করিয়া একটি লম্পট "কৃষ্ণের" লীলার যোগ্য হইতে ইচ্ছা করে, এই হেতু অধুনা বিবেচক ব্যক্তিগণ স্বীয় কন্যাদিগকে রাধা নাম প্রদান

করিতে দ্বিধা বোধ করেন। ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে নিতান্ত ঘৃণার কথা।

কেহ কেহ বলেন, পুরাণসমূহকে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়; শাস্ত্রাংশ ও গল্পাংশ। পুরাণের গল্পাংশ বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং পরিত্যজ্য; উহার শাস্ত্রাংশ বেদসম্মত, সুতরাং গ্রহণীয়। কিন্তু গল্পাংশ পরিত্যাগ করিলে, পুরাণের পুরাণত্ব ও বিশেষত্ব থাকে না। শাস্ত্রাংশ বেদ হইতেই সঙ্কলিত; সুতরাং বেদ থাকিতে উহার কোন বিশেষ আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। পুরাণ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবতাতত্ত্ব।

দেবতাতত্ত্ব আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, অহল্যার উপাখ্যান সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেবতা কাহাকে বলে এবং বাস্তবিক দেবতা আছেন কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে অনেক মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। বেদই এই সকল প্রশ্নের উত্তম মীমাংসা। বেদের মতে দেবতাগণ আছেন। যেমন পশুগণ হইতে মনুষ্যগণ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মনুষ্যগণ হইতে দেবতাগণ শ্রেষ্ঠ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের মতে পশুজাতিই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছে, এবং কালক্রমে মনুষ্যজাতি উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অন্য এক শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে ; সেই উৎকৃষ্ট জাতির আবির্ভাব এখনও হয় নাই, আপাততঃ মনুষ্যজাতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বেদের মতে মনুষ্যজাতির উপরি দেবজাতি বর্ত্তমান রহিয়াছে ; মনুষ্যজাতির মধ্যে যাঁহারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই দেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

"মর্ত্ত্যা হ বা অগ্রে দেবা আসুঃ।"

"দেবা উ বা অগ্র অথ মনুষ্যাঃ।"

"যথা বৈ মনুষ্যা এবং দেবা অগ্র আসন্।"
"যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ সুবর্গং লোকমায়ন্।"
(কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদসংহিতা ; শতপথব্রাহ্মণ)।

অর্থাৎ, দেবতারা দেবতা হইবার অগ্রে মর্ত্ত্যই ছিলেন। অগ্রে দেবতারা মনুষ্য ছিলেন। যাহাকে মনুষ্য বলে দেবতারা অগ্রে তাহাই ছিলেন। যজ্ঞ দ্বারাই দেবতারা সুবর্গলোকে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ, মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা দেবতার সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তাঁহারাই মৃত্যুর পরে দেবতাদিগের গণভুক্ত হন।

দেবতা মনুষ্যের পরম পরিণতি। মনুষ্যগণ হইতে দেবতারা সকল প্রকার সদ্গুণে শ্রেষ্ঠ। কোন মনুষ্য উৎকৃষ্টচরিত্রবান্ হইলে তাঁহাকে দেবচরিত্র পুরুষ বলা হয়। যদি বেদকর্ত্তৃক দেবতাবিষয়ে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত স্থির হইল, তাহা হইলে যে সকল পাপ করিতে মনুষ্যগণ সঙ্কোচ বোধ করে, দেবতারা সেই সকল পাপ কদাচ করিতে পারেন না। ইন্দ্র কদাচ গুরুপত্নী গমন করেন নাই।

দেবতাতত্ত্ব লইয়া বেদে তর্কবিতর্ক করা হয় নাই। কারণ, বেদ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক দেবযজন করিলে মনুষ্য দেবতাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও দেবতার সহিত কথোপকথন করিতে পারে। মনুষ্যগণ বৃথা তর্কবিতর্ক না করিয়া এই

অহল্যা উপাখ্যান।

উৎকৃষ্ট দেবযজন কর্ম্মকে তাহাদের জীবনের সার করিবে, ইহাই বেদসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যজ্ঞ।

দেবযজন প্রসঙ্গে একটি গুপ্তবিদ্যা আছে, তাহা এই—"ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ" (ঋগ্বেদ—৪-৫৮-১)।

দেবতাদিগের শরীর অগ্নিময়; সেই হেতু অগ্নিই তাঁহাদের প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি। তাঁহারা অগ্নি দ্বারাই আকর্ষিত হন এবং অগ্নিতেই আবির্ভূত হন। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, দেবতাগণের উদ্দেশে তাঁহাদের সমানজাতীয় অগ্নি দ্বারা দীপদান করিলে তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। (মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৯৮ অধ্যায়)। পরন্তু গব্যঘৃত প্রজ্বলিত হইয়া যে অগ্নিতে পরিণত হয়, সেই অগ্নিই দেবতাগণের জন্য পরমপবিত্র। এই অগ্নিকে যজ্ঞাগ্নি বলে; এবং যজ্ঞাগ্নির অধিষ্ঠাতা দেবতাকে অগ্নিদেব বলে। অগ্নিদেব দেবতাগণের উদ্দেশে দূতস্বরূপে মর্ত্ত্যগণের বার্ত্তা বহন করেন বলিয়া "বহ্নি" ও "দেবদূত" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ—৩-১১-৪, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ—২-৫-৮-৫)। যজ্ঞাগ্নি "অধ্বর" হওয়া আবশ্যক। বৈদিক পরিভাষায় অধ্বর শব্দের অর্থ হিংসা-রহিত। (ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা অস্য ইতি অধ্বরঃ

হিংসারহিতঃ, ইতি সায়ণাচার্য্যঃ। ঋগ্বেদভাষ্যে ১-১-৪)। যদি যজ্ঞাগ্নি অধ্বর হয়, অর্থাৎ, যদি দেবযাজক ব্যক্তির মন হিংসাদ্বেষপ্রভৃতি দোষে দুষ্ট না হয়, তাহা হইলে প্রথমে সেই অগ্নি হইতে দৈববাণীর শ্রবণ ও পশ্চাৎ সেই অগ্নিতে দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। ইহাই বেদ, এবং ইহাই মানবজাতির সনাতনধর্ম্ম,—স্বধর্ম্ম। যজ্ঞ শব্দের অর্থ দেবযজন, উহাতে পশুবলির অর্থ আদৌ ছিল না।

বেদের মতে, মনুষ্য প্রথমে দেবতার সহিত সম্বন্ধ না হইয়া একবারে ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হইতে পারে না। দেবতার সহিত সম্বন্ধ হইবার উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নির প্রজ্জ্বলন করা আবশ্যক এবং যজ্ঞাগ্নির উদ্দেশে গোজাতিকে রক্ষা করা আবশ্যক। এই জন্য বেদে গোবধ করা মনুষ্যজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গোবধের নিষেধ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞাগ্নির ত্যাগ করাই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, দেশে অত্যধিক পরিমাণে ঘৃতের সঞ্চয় হইলে, লোকসমূহ সেই ঘৃত যজ্ঞাগ্নির নিমিত্ত অবশ্য ব্যয় করিবে। কালক্রমে গোবধের প্রভাবে ঘৃত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী হওয়ায়, যজ্ঞাগ্নি ও দেবযজন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং দেবতারা এখন আর মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন না। এখন মনুষ্যগণ এক নবীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, দেবতাসাধন কোন ধর্ম্ম নহে, উহা একপ্রকার কৌতুকবিদ্যা (ম্যাজিক),

উহা দ্বারা মুক্তির ও উন্নতির পথে বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হয়; সুতরাং দেবযজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক ঈশ্বরকে ভজন করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। এই নবীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে স্বর্গলোক ও মর্ত্ত্যলোকের সম্বন্ধ লুপ্ত হওয়াতে মর্ত্ত্যলোক একপ্রকার নরকে পরিণত হইয়াছে; ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

দেবযজন দ্বারা কেবল মৃত্যুকালে স্বর্গারোহণ করা যায়, তাহা নহে। উহা দ্বারা জীবনকালে ইহলোকের প্রভূত কল্যাণ করা যায়। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যদিগের ভোগের নিমিত্ত বিবিধ সুখ প্রেরণ করেন। যথাকালে বৃষ্টি, প্রচুর ধনধান্যের উৎপত্তি, নিরুপদ্রবে জীবনযাপন, পারিবারিক সুখশান্তি, দীর্ঘজীবন, উত্তম সন্তানপ্রবাহ, অক্ষয়কীর্ত্তি, তেজ ও বীর্য্যের আবির্ভাব, এবং ধর্ম্মে অভিরুচি, এ সকলই দেবযজন দ্বারা মনুষ্যগণ প্রাপ্ত হইতে পারে।

দেবতাতত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, দেবতাগণের শরীর অগ্নিময় এবং সেইজন্য দেবতারা অগ্নি ভিন্ন অন্যত্র আবির্ভূত হন না। দেবতারা মনুষ্যকে স্পর্শ করেন না; দেবতার স্পর্শে মনুষ্য মৃত হয়। অতএব দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাকে স্পর্শ করেন নাই; কারণ, স্পর্শ করিলে অহল্যা তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেকালের কথা।

যে কালে বেদে ইন্দ্রকে "অহল্যাজার" বলা হইয়াছিল, সেই কাল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে, পৌরাণিক অহল্যার গল্প সত্য হইতে পারে না। সে কালে দেবতারা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেন। এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এ বিষয়ে বেদভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না। বেদে এরূপ কোন উক্তি নাই যে, সে কালে দেবতারা সহজসাধ্য ছিলেন এবং সদাসর্ব্বদা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেন। প্রত্যুত অতি কঠোর সাধনার পরে কখন কোনও ঋষি দৈবাৎ কোন দেবতাকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিতে পারিতেন। যে স্থানে কোন দেবতার আবির্ভাব হইত সেই স্থান প্রয়াগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইত। প্রয়াগ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট যাগ, অর্থাৎ যেখানে যাগযজ্ঞের অগ্নি প্রকৃষ্টফল প্রদান করিতে পারিয়াছে। প্রয়াগসমূহের সংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেবতারা

ঋষিদিগের যাগে কদাচিৎ আগমন করিতেন। কিন্তু, দেবতারা মর্ত্তালোকে ঋষিদিগের নিকটে আসিয়াছিলেন, যদি এই ঘটনা একবারের জন্যও পৃথিবীতে ঘটিয়াছিল হয়, তাহা এই পৃথিবীর পক্ষে কম কথা নহে। ঋষিদিগের যজ্ঞে দেবতারা আগমন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মনুষ্যমাত্র এক উচ্চ আদর্শের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সকলেই ঋষিদিগের অনুবর্ত্তন করিত। সকলেই যাহাতে শান্তিতে জীবন যাপন করিয়া অবশেষে স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইত। এই হেতু সে কালে মনুষ্যগণ রাজশাসন ব্যতিরেকেও ধর্ম্মপথে স্বতঃ প্রবৃত্ত থাকিত।

আর্য্যাচার সংস্থাপন।

যাহাতে দেবলোকের সহিত মর্ত্ত্যলোকের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় তাহাই আর্য্যদিগের আচার ও ধর্ম্ম প্রভৃতির মূলমন্ত্র ছিল।

মনুষ্যদিগের নিকৃষ্টভাবসকল দেবতাদিগের অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। দেবতারা পবিত্রভাবসম্পন্ন। তাঁহারা মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা শুচিস্বভাব ও একাগ্রচিত্ত তাহা-দিগকেই অনুগ্রহ করেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে।" অর্থাৎ, যাহার মনঃ

পরস্ত্রীতে আসক্ত, সে কখনই দেবতাসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। দেবতাগণ কদাচ লম্পট-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকটে আগমন করেন না।

পুরাকালে ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের কোন কোন কার্য্যের, চিন্তার, অথবা বাক্যের ফলে দেবতাগণ বিমুখ হইতেন, এবং মনুষ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের সকল সম্বন্ধ রহিত করিয়া দিতেন। সেই সকল কার্য্যাদি মনুষ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল। ঋষিগণ সেই সকল কার্য্যাদি উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে মানবদিগের জন্য কতিপয় নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সকল নিয়মই কালক্রমে গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। সে কালে মনুষ্যগণ স্বর্গলাভেচ্ছু হওয়ায় ঐ সকল নিয়ম অনুসারেই চলিত।

ঋষিপ্রণীত নিয়মসমূহের মধ্যে ব্যভিচারের কোনও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। গৃহ্যসূত্রসমুদায় হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ঋষিদিগের চক্ষে ব্যভিচার অতীব গর্হিত ও অসহনীয় দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত, কদাচ তাঁহারা ঐ দোষকে ক্ষমার যোগ্য মনে করিতেন না। ঋষিরা জানিতেন যে, স্ত্রীপুরুষের শরীর শুদ্ধ না থাকিলে কখনই তাহাদিগের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হন না; এইজন্য

অহল্যা উপাখ্যান।

ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যকে নিজজীবনের আদর্শ করিতেন, এবং স্ত্রীদিগকে একপতিব্রতা ও পুরুষদিগকে একপত্নীব্রত হইয়া থাকিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ব্যভিচারপরায়ণ নরনারীগণ ঋষিপ্রদর্শিত স্বর্গপথের পক্ষে ব্যাঘাতস্বরূপ। তাহারা কেবল আপনারা স্বর্গপথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না, পরন্তু অপর সকলকে ভ্রষ্ট না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। এই হেতু ঋষিগণ ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের প্রতি বধদণ্ডের অনুমোদন করিয়াছিলেন। (ঋগ্বেদ—১০-৯৯-৩)। বধ-দণ্ডের উদ্দেশ্য এই যে, দুষ্টবীজকে পৃথিবী হইতে একবারে নির্ম্মূল করা, যাহাতে দুষ্টজাতির আর উৎপত্তিই হইতে না পারে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ব্যাভিচার হইতে উৎপন্ন সন্তানগণ স্বভাবতঃ পাপকর্ম্মে রত হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্যগণের উচিত, যাহাতে তাদৃশ সন্তানগণের উৎপত্তি হইতে না পারে, তাহাই করা। (মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৮ অধ্যায়, ৪০-৫০ শ্লোক)। বেদে উক্ত আছে, "যদি আমার মাতা লোভবশতঃ অপতিব্রতা হইয়া পাপে লিপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার জন্ম সেই দুষ্টরেত হইতে না হইয়া, যেন আমার পিতার রেত হইতেই হইয়া থাকে।" এই বেদবাক্যেরও তাৎপর্য্য উক্ত প্রকার। (মন্ত্রপাঠব্রাহ্মণ—২-১৯-১; হিরণ্যকেশীয়

গৃহ্যসূত্র—২-১০-৭ ; শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র—৩-১৩-৫ ; আপস্ত-ম্বীয় শ্রৌতসূত্র—১-৯-৯ ; মনুসংহিতা—৯-২০)।

ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তিদিগের দোষে সমগ্র মানব-জাতিকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় ; এই জন্য ব্যভিচারীব্যক্তিরা সকলের নিকটেই অপরাধী ও সকলেরই বধ্য। বেদে উক্ত আছে যে, পিতৃগণ মৃত্যুর পরেও নিজ নিজ বংশের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, এই হেতু শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যদি কোন বংশে জারজসন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ সেই বংশের প্রতি বিমুখ হন, এবং সেই বংশধরগণের প্রদত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি আর গ্রহণ করেন না। ইহার ফলে সেই বংশের প্রভূত অনিষ্ট হয়। ভগবদ্গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে। যথা, "সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥" (গীতা —১-৪২)। "ন শেষোঽগ্নে অন্যজাতমস্তি," এই বেদ-বাক্যেরও উহাই তাৎপর্য্য। (উক্ত গীতাশ্লোকে নীল-কণ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য)। "অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্য-ধ্বম্" এই অপর গীতাবচনেরও উহাই তাৎপর্য্য। (গীতা —৩-১০ ; শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

স্বর্গের দিকে অগ্রসর হওয়াই মানবজাতির স্বধর্ম্ম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ব্যভিচারদোষ ও সতীত্বনাশ প্রভৃতি

পাপ দ্বারা মনুষ্যজাতির স্বর্গারোহণের পথ অবরুদ্ধ হয়। ঐ সকল পাপ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ সকল পাপ অস্বর্গীয় অর্থাৎ স্বর্গপথের অবরোধক বলিয়াই মানবজাতির মনে উৎকট ঘৃণার সঞ্চার করে। ঐ সকল পাপের প্রতি মানবজাতির মনে যে

উৎকট ঘৃণা ও প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন নীচ স্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত নহে। অবলাগণের সতীত্বরক্ষার প্রযত্ন তাহাদের স্বার্থপরতার পরিচায়ক নহে; সতীধর্ম্ম মানবজাতির উন্নতিসাধনের প্রধান উপকরণ; সেই জন্যই ঐ প্রযত্ন সৃষ্টির একটি অন্তরঙ্গ শক্তি হইয়া মাতৃজাতির স্বভাবে জন্মাবধি দৃঢ়ভাবে নিহিত আছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, দেবতাগণ সচরাচর স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত মৃদুভাবাপন্ন; কিন্তু ব্যভিচারিণীদিগের প্রতি তাঁহারাও উগ্রভাব ধারণ করেন। দেবতার স্তোত্রপাঠে "শাকিনীকালরূপম্," "ডাকিনীনাশনম্," ইত্যাদি শব্দ দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়; ইহার উক্তপ্রকার তাৎপর্য্য সহজেই বোধগম্য করা যায়। মহাভারতে উক্ত আছে যে, অবতারগণ দুষ্টদমন ও অসতীনিগ্রহ এই উভয়কর্ম্মেই ব্রতী হইয়া আগমন করেন। এই সকল কারণ অবগত হইয়াই ঋষিগণ দুষ্টবীজবপনকারিস্বরূপ ব্যভিচারপরায়ণদিগের প্রতি বধদণ্ডের

অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন, এবং উৎকৃষ্ট সন্তান-সন্ততিলাভের উদ্দেশে গৃহ্যসূত্রসমূহে বিবিধ নিয়ম সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। সতীত্বনাশ করিবার অপরাধে দুষ্ট ব্যক্তির প্রতি বধদণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত, একথা সকলেই স্বীকার করিবে।

যে কালে শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন দেবতারা মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতেন, এবং শুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন ঋষিগণ মনুষ্যদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মপথের সংস্থাপন করিতেন, সেই কালে বেদে ইন্দ্রকে "অহল্যাজার" বলা হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ঐ বাক্যে ব্যভিচার সম্বন্ধে কোন কথা থাকিতে পারে না। অহল্যা শব্দের অর্থ রাত্রি; রাত্রির ধর্ম্ম অন্ধকার; বজ্রহস্ত ইন্দ্র বিদ্যুৎ দ্বারা সেই অন্ধকারকে জীর্ণ করেন, এই হেতু তিনি "অহল্যাজার"। ইহাই ঐ শব্দটির প্রকৃত অর্থ। পরে কবিকল্পনায় যাহা উদ্ভুত হইয়াছিল তাহা একটি গল্প বৈ আর কিছুই নহে। অধুনা হিন্দুগণ গল্পকে সত্য ও সত্যকে গল্প বলিয়া এক অভিনব ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছে। দেবতারা অগ্নিমধ্যে প্রত্যক্ষ হইত, ইহা গল্পকথা; কিন্তু দেবতারা ব্যভিচারে আসক্ত ছিল, ইহা সত্য কথা;—ইহাই অভিনব হিন্দুধর্ম্ম।

ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন।

পুরাকালে ঋষিগণ পতিপত্নীকে একসহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেন। স্ত্রী স্বামীর সহিত যজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ দেবোপাসনা দ্বারা সংযুক্তা, এই কারণে পতি-শব্দ হইতে স্ত্রী অর্থে পত্নীশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ("পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে" ;—পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৪-১-৩৩)। এই জন্যই স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা হয়। বেদে উক্ত আছে যে, মনুষ্যদম্পতী একসহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহারাই দেবদম্পতীতে পরিণত হয়। (ঋগ্বেদ—১-১৩১-৩ ; ৫-৪৩-১৫)।

স্বয়ং ঋষিও স্বীয় "ঋষিপত্নী"র সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা শুদ্ধশরীর ও পুত্রোৎপাদনপরাঙ্মুখ থাকিয়া উভয়ে যজ্ঞের নিমিত্ত অগ্নি উৎপাদন করিতেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে দেবদম্পতী আবির্ভূত হইতেন। তাঁহারাই মনুষ্যদম্পতীর স্বর্গলোকে চিরকাল একত্রবাসের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বেদে উক্ত আছে, কোন মনুষ্যদম্পতীর অনুষ্ঠিত যজ্ঞে দেবদম্পতী আবির্ভূত হইলে, সেই মনুষ্যদম্পতীও উভয়ে একসঙ্গে স্বর্গারোহণ করে।

এই সম্প্রদায়ের ঋষিগণকে "আরণ্য" বলা হইত।

তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসমূহ "আরণ্যক" নামে বেদ-বিভাগে প্রসিদ্ধ আছে। অনেকে মনে করেন যে, "আরণ্যক" এই বাক্যের অর্থ "অরণ্যে গমনপূর্ব্বক পাঠ্য"। ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তিমূলক কল্পনা। আরণ্যক গ্রন্থসমূহে অরণ্যবিষয়ক কোন কথাই পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ "অরণিপ্রমথনজনিত অগ্নির", অর্থাৎ শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডযুগলের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত অগ্নির, কথাতেই পরিপূর্ণ। "অরণি" শব্দ হইতেই আরণ্যক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আরণ্য ঋষিগণ লোকালয় হইতে দূরে বাস করিতেন, এই হেতুই আরণ্যক অর্থে অরণ্যশব্দসম্বন্ধীয় ভ্রান্তি ঘটিত হইয়াছে।

আরণ্যদম্পতীকর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নি হইতে গৃহস্থগণ স্বকীয় দেবযজনার্থ অগ্নি আনয়ন করিত ও সেই অগ্নিকে স্ব স্ব গৃহে গার্হপত্যাগ্নিরূপে রক্ষা করিত। ঋষিদম্পতী-দিগের দৃষ্টান্ত দ্বারা আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে বিবাহবন্ধন পরমপবিত্রতা লাভ করিয়াছিল। একবিবাহপদ্ধতিই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই পক্ষে নিয়মিত হইয়াছিল। আর্য্যপত্নী ও তাঁহার হোমধেনু মানবজাতির জন্য স্বর্গের সোপান বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। তাহারা উভয়েই নিঃশঙ্ক-চিত্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিত, কদাচ কেহ তাহাদিগকে কোনরূপ অবমাননা করিতে পারিত না। এই প্রকারে

অহল্যা উপাখ্যান।

প্রাচীনভারতে তেজস্বিনী সতীরমণীগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, যাঁহাদের তুলনা পৃথিবীতে অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবতী তেজস্বিনী রমণীগণ বরং পতিহীন অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতেন, কিন্তু কদাচ ভীরু কাপুরুষকে স্বীয় পতিত্বে অধিকার দিতেন না। তাঁহারা কেশের কবরীবন্ধনের মধ্যে কৃপাণ ধারণ করিতেন, এবং নিয়মিতবিধির অনুসারে সেই কৃপাণের উপাসনা করিতেন। কৃপাণের উপাসনা তাঁহাদিগকে ধর্ম্মরক্ষার বিষয়ে সর্ব্বদা অবহিত ও তেজস্বিনী করিয়া রাখিত।

আর্য্যদিগের বিবাহে বরের মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও হস্তে তরবারি, এবং কন্যার মস্তকে কবরীবন্ধন ও হস্তে কৃপাণ ধারণ করা বিহিত ছিল। ইহা দ্বারা তাহাদিগকে দুষ্টব্যক্তিগণের হস্ত হইতে বিবাহের পবিত্রতা সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইত। সে কালে নিরস্ত্র পুরুষগণ কদাচ দারপরিগ্রহের যোগ্য বলিয়া গণ্য হইত না; সুতরাং বালবিবাহ তখন প্রচলিত ছিল, ইহা কদাচ বলা যাইতে পারে না। পরিণতবয়সে বিবাহ হইত বলিয়া তখন বিধবাবিবাহের প্রয়োজন হইত না। পুরুষগণ স্ত্রীহীন হইলে, ও নারীগণ পতিহীন হইলে, তাহাদের পক্ষে পরলোকচর্চ্চার সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া

তাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে, ইহাই শাস্ত্রের শাসন ছিল। বস্তুতঃ কাহারও পক্ষে পরলোকচর্চ্চার সময় উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করা শাস্ত্রানুমোদিত কর্ম্ম নহে; কারণ, উহাতে নরকসদৃশ দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। "অরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥" (ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যোদ্ধৃত স্মৃতিবচন—৩-৪-৪৩)।

যাহা হউক্, যে কালে সমাজের ব্যবস্থা উক্তরূপ ছিল, সে কালে ব্যভিচার দোষের অনুষ্ঠান করিয়া পূজ্য হওয়া বা ক্ষমালাভ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। সে কালে, ব্যভিচার রাজা ও প্রজা উভয় কর্ত্তৃকই শাসিত হইত; রাজা ঐ শাসনে অবহেলা করিলে তাঁহাকেই প্রজাবর্গের নিকটে অপরাধী হইতে হইত। ইহা মহাভারত হইতে উত্তমরূপে প্রমাণিত হয়। "যে রাজার রাজ্যে দুরাত্মারা রোরুদ্যমান স্ত্রীকে তাহার পতিপুত্রগণের সমক্ষেই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রাজা জীবন্মৃত। প্রজারা সমবেত হইয়া সেই ধর্ম্মসংহারক নির্দ্দয় রাজকুলাঙ্গারকে বিনষ্ট করিবে। যে রাজা রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, উন্মাদরোগাক্রান্ত কুক্কুরের ন্যায় তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নিহত করা কর্ত্তব্য।" (মহাভারত,

অহল্যা উপাখ্যান।

অনুশাসনপর্ব্ব, ৬১ অধ্যায়, ৩১, ৩২, ৩৩ শ্লোকাঙ্ক; অবলাকান্ত সেন কৃত অনুবাদ)।

এই সমুদায় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সে কালে অতি কঠোর সামাজিকশাসন ও রাজশাসন দ্বারা নারীদিগের সতীত্ব রক্ষা করা হইত। সেই সকল সতী-নারীদিগের পুত্রগণও সতীমাতাদিগকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিত। যে স্থানে কোন নারী সতীত্বের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইতেন সেই স্থান তীর্থস্থানে পরিণত হইত, এবং হিন্দুসন্তানগণ সেই স্থানকে পুণ্যভূমিরূপে দর্শন করিয়া সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিত। এই প্রাচীনাচার হইতেই পুরাণে সতীর দেহত্যাগ নামক গল্পের সঙ্কলন ও তৎসম্বন্ধীয় পীঠস্থানসমূহের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যে কালে সমাজের দৃষ্টি ও বল সতীত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উন্মেষিত থাকিত, সেই কালে দেবরাজ ইন্দ্রকে "অহল্যাজার" বলা হইয়াছিল। ইহা হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, অহল্যাজারের অর্থে পরস্ত্রী-ব্যভিচারের কোন কথা থাকিতে পারে না, কিন্তু কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি আচার্য্যগণ ঐ বাক্যের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সত্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একালের কথা।

সে কালের কথা বলা হইল, এখন একালের কথা বলা হইতেছে। একালেও সতী নারী দুরাত্মার হস্ত হইতে নিজ সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু কোন পুরুষই এই সকল সতীনারীর যথোচিত সমাদর করে না। দেশের সর্ব্বত্র বীরপুরুষ-দিগের এবং সুন্দরীকামিনীদিগের পটাঙ্কিত চিত্র অথবা মর্ম্মরনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বিশেষতঃ, রূপবতীবারাঙ্গনাদিগের উলঙ্গচিত্র ধনবান্‌দিগের বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। কিন্তু যে সকল সতী নিজের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাপুরুষগণের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন, সে সকলের মধ্যে একজনেরও চিত্রপট বা প্রস্তরমূর্ত্তি ত কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কুপথগামিনীনারীদিগের প্রতি আধুনিক সভ্যপুরুষদিগের অত্যন্ত সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রেষ্ঠপুরুষগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া কতই নূতন নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিতেছেন। এদিকে

যাহারা সতী সাধ্বী, কিন্তু কালের দোষে নিজদের সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে সৎপথে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্য কেহই কোন উপায়ের উদ্ভাবন করে না। ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে সতীদিগকে বলা হইতেছে যে, তাহারা অসৎপথে আসিলেই পুরুষদিগের সহায়তা লাভ করিবে ও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে। এইরূপে নিরুপায়সতীদিগকে প্রথমে অসৎপথে প্রবৃত্ত করাইয়া পশ্চাৎ আবার তাহাদিগকেই অসৎপথ হইতে উদ্ধার করা হইতেছে। ইহাই অহল্যাউদ্ধারের প্রকৃত অনুকরণ।

অসতীগণের উদ্ধারের ন্যায় বিধবাগণের বিবাহও আধুনিক সভ্যপুরুষদিগের উৎকট চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বিধবাগণ কখনই পুনর্বিবাহের জন্য লালায়িত হয় না; পুরুষগণই তাহাদিগকে ঐকর্ম্মে প্ররোচিত করে। বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল বিধবার জন্য পতির আবশ্যকতা আছে বলিয়া বিবেচনা হয় তাহাদিগকে গ্রহণ না করিয়া, যে সকল বিধবার ধনসম্পত্তি আছে তাহাদিগকেই পুরুষগণ বিবাহের নিমিত্ত মনোনীত করে। পুরুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অবনতির লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

একালে দেবতাগণের মর্ত্ত্যলোকে আগমন করা

একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; সেই হেতু মনুষ্যগণ স্বর্গের কথা ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্বর্গলোক ও দেবতাগণ আছে বলিয়া আর বিশ্বাস করিতে পারে না। পরলোকের কথা বিস্মৃত হইয়া সকলেই ইহলোকে সম্পূর্ণ সুখভোগ সমাপ্তি করিবার লালসায় মগ্ন হইয়াছে। ইহার ফলে পাপকর্ম্ম, লাম্পট্য, ব্যভিচার প্রভৃতিতে লোকদিগের অত্যন্ত আসক্তি জন্মিতেছে। ঋষিদিগের কুল আর নাই; তাঁহাদের প্রণীত গৃহ্যসূত্রসকল আর কাহারও নিকট গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। এখন কুরুচিপূর্ণ নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। ব্যভিচারের ফলে দুষ্টবীজের অজস্র বৃদ্ধি হইতেছে। দুষ্টবীজসম্ভূত ব্যক্তিগণ ব্যভিচার ও সতীত্বনাশ করাকে কাপুরুষোচিত পাপকর্ম্ম বলিয়া মনে করে না, প্রত্যুত বীরোচিত দিগ্‌বিজয়ের সদৃশ মনে করে। অধুনা সমাজে তাহাদের প্রভাব অধিক; সেই হেতু দণ্ডপ্রদানের ব্যবস্থা তাহাদেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে। তাহারা ব্যভিচারের প্রতি লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া বিবাহবন্ধনকে শিথিল ও কলুষিত করিতেছে। নারীগণ আর সে কালের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে যথাতথা ভ্রমণ করিতে পারে না। সর্ব্বদা তাহাদিগকে কাপুরুষদিগকর্ত্তৃক অবমাননার ভয়ে থাকিতে হয়।

অধিকন্তু একালে দুর্ব্বৃত্তপুরুষকর্ত্তৃক কোন সতীনারীর সতীত্ব নাশ করা হইলে, সেই সতীনারীকেই অসতর্কতার অপরাধে দোষীসমস্থ করা হয়; কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্ত-কাপুরুষকে অসমসাহসী বীরপুরুষ বলিয়া অনেক ব্যক্তি আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়। রাজশাসন দ্বারা প্রজাসমূহকে নিরস্ত্র করার ফলে তাহারা নখদন্ত-শৃঙ্গাদিবিহীন পশুর ন্যায় নিস্তেজ ও খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। পুরুষগণ অস্ত্রধারণ করিতে ও নারীগণ কৃপাণপূজা করিতে আর পারে না; করিতে ইচ্ছাও করে না। ক্ষত্রিয়দিগের বিবাহকালে বরের মস্তকে টোপর ও কন্যার হস্তে কোন প্রকার কর্ত্তনযন্ত্র দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঐ আচারের তাৎপর্য্য কেহই জানে না; জানা আবশ্যকও মনে করে না। বরের টোপর, প্রজার উষ্ণীষ, রাজার মুকুট, এই সকল বস্তু যোদ্ধার শিরস্ত্রাণের অনুকরণ; উহাতে পুরুষের শৌর্য্যবৃদ্ধি করে। যোদ্ধাব্যক্তির ন্যায় মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করা পুরুষদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য; ইহা বেদের শাসন। ঋষিগণ এবং সে কালের জনসাধারণ মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন; উষ্ণীষধারণ পরিত্যাগ করা বেদের ও আর্য্যাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম। (অথর্ব্ববেদ—১৫-২-১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

—৬-১ ; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র—৫-১২ ; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র—২২-৪-১০)।

বঙ্গদেশের হিন্দুজনসাধারণের মধ্যে মস্তকে উষ্ণীষ-ধারণের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার পরে, বঙ্গদেশকে বাদসাহের পদতলে চিরকাল অবনতমস্তক করিয়া রাখিবার চিহ্ন-স্বরূপে, বঙ্গবাসীহিন্দুদিগকে শিরশ্ছেদদণ্ডের ভয় দেখাইয়া মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন ; তদবধি বঙ্গদেশের হিন্দুগণ উষ্ণীষ-ধারণ পরিত্যাগ করিয়াছে। আর্য্য, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকল জাতির পুরুষগণ মস্তকে কোনরূপ উষ্ণীষ ধারণ করিয়া থাকে, ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসীহিন্দুগণের চেতনা হয় না।

পুরাণের প্রচলন।

একালে হিন্দুগণ বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরাণের গল্পাংশসমূহকে স্বধর্ম্মে পরিণত করিয়াছে। পুরাণ-সমূহের গল্পাংশের ফল জনসমাজের পক্ষে ভাল হয় না, এ বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠোক্ত অহল্যার উপাখ্যানই উত্তম প্রমাণ। হিন্দুগণ অধুনা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা আর সে কালের মত সস্ত্রীক

ধর্ম্মাচরণ করিতে ভালবাসে না। গৃহস্বামী নিজে ধর্ম্মকর্ম্ম না করিয়া পুরোহিত দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য করান, এবং মনে করেন যে ঐরূপ করা তাঁহার নিজের করা অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ। যে সময়ে তাঁহার গৃহে পুরোহিত-ঠাকুর আগমন করিয়া দেবতাকে পূজা করিতেছেন সেই সময়ে হয়'ত গৃহস্বামী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এবং বারাঙ্গনাবিহারে রত থাকিয়া সেই পূজার সুফল প্রাপ্ত হইবার অধিকারী হইতেছেন। এদিকে তদীয় পত্নী পুরোহিতের সহিত "যজ্ঞসংযুক্ত" হইয়া হয়'ত পুনরায় এক নবীন অহল্যার অভিনয় করিতেছেন। একালে পুরুষগণ সহধর্ম্মিণীদিগের সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করা অত্যন্ত বিরক্তিকর বলিয়া বোধ করেন, কিন্তু রসবতীদিগের সহিত দোললীলা করিতে পুলকিত হইয়া থাকেন। এই দোললীলা উপলক্ষে নারীগণের প্রতি পুরুষদিগকর্ত্তৃক ধর্ম্মের নামে যে সকল বীভৎস অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, অহল্যার উপাখ্যান সে সকলের তুলনায় তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুগণ আপনাদিগের কুরুচি দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কলুষিত করিয়া বিবিধ গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং সেই সকল গল্পে নিরন্তর রত থাকিয়া তদনুসারে অতি গর্হিত কর্ম্ম সকল করিতেছে।

সেকালে অগ্নিই হিন্দুদিগের একমাত্র পুরোহিত

ছিল। সেই পুরোহিতের সাহায্যে দেবযজন করা হিন্দুদিগের অতি পবিত্র ধর্ম্ম ছিল; একালে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেবতাপূজা এখনও আছে, কিন্তু উহা প্রতিমা দ্বারা করা হইয়া থাকে এবং উহাতে ধর্ম্মের লেশমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন হিন্দুগণ পূজাকর্ম্মের সহিত বিবিধ অশ্লীল ও নিন্দার্হ ব্যাপারের সংমিশ্রণ করিয়াছে। স্ত্রীপুরুষদিগের লীলা-ঘটিত জঘন্যব্যাপারসমূহই একালে হিন্দুদিগের পূজার সামগ্রী বলা যাইতে পারে। একালে দেবতারা আর মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন না। সুতরাং যে সকল স্থানে সে কালে দেবতাদের আগমন হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, একালে হিন্দুগণ সেই স্থানসমূহ কেবল দর্শন করিয়াই পরম প্রীতি লাভ করে। এই প্রকারে সমগ্র হিন্দুসমাজে তীর্থযাত্রারূপ এক নবীন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। বস্তুতঃ সে কালে যজ্ঞাগ্নিই হিন্দুদিগের একমাত্র তীর্থ ছিল; সেই তীর্থ দর্শনের জন্য কাহাকেও বিদেশে ভ্রমণ করিতে হইত না। গৃহে থাকিয়াই স্ত্রীপুরুষগণ সেই পরম পবিত্র তীর্থের সেবা করিত। তীর্থযাত্রা পৌরাণিক গল্পসমূহ হইতে সমর্থন লাভ করিয়া ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এ কালের তীর্থসমূহে বহুদেশ বিদেশ হইতে আগমন করিয়া নানাজাতির স্ত্রীপুরুষগণ

একত্র সমবেত হয়। প্রকৃতির নিয়ম কেহই অন্যথা করিতে পারে না। তীর্থসমূহে যাত্রীদিগের মন ধর্ম্মব্যাপারে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয় না; কিন্তু পুরুষদিগের দৃষ্টি স্ত্রীলোকগণ আকর্ষণ করে। এই হেতু হিন্দুদিগের তীর্থে ও দেবমন্দিরে যে সকল বিভ্রাট্‌ ঘটিয়া থাকে সে সকল প্রায়ই স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচারদোষমূলক। তীর্থস্থানের সুযোগ অবলোকন করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ ঐ সকল স্থানে কোন জীবিকা অবলম্বনপূর্ব্বক তথায় নিবাস করে। ফলতঃ তীর্থযাত্রাদ্বারা ধর্ম্মের প্রসার না হইয়া ধর্ম্মের নাশ ও অধর্ম্মের প্রসার হইয়া থাকে।

যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, একালে হিন্দুগণের মনে অধর্ম্মের রুচি উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরূপ রুচিবিকার হইলে মনুষ্য ধর্ম্মের উপদেশেও অধর্ম্মের ইঙ্গিত দেখিতে পায়, এবং সেই ইঙ্গিতমাত্রে ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। হিন্দু-সমাজের এতাদৃশ অবস্থায় ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলিলে ব্যভিচারের তাৎপর্য্যই হিন্দুগণ আদর করিয়া গ্রহণ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

ম্লেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব।

একালে ম্লেচ্ছদিগের রাজত্বলাভ করার ফলে ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীপুরুষসংক্রান্ত পাপের অত্যন্ত প্রবল

বিস্তার হইতেছে। এই ম্লেচ্ছগণ অতি প্রাচীনকালেও বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিত। তাহারা অর্থনিষ্ঠ ও গোখাদক ছিল; এবং সেই হেতু "গোঘ্ন অতিথি" বলিয়া ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা অর্থের লালসায় তাহাদের সুন্দরীস্ত্রীদিগকেও বিক্রয় করিত। তাহাদের বিবেচনায় সতীত্বের অর্থমূল্য ছিল। ব্যভিচার ও সতীত্ব-নাশের প্রতি অর্থদণ্ড হইলেই তাহারা যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে বোধ করিত। তাহারা স্ত্রীজাতিকে বলপূর্ব্বক হরণ করা ও তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা, পুরুষের পক্ষে গৌরবের কার্য্য মনে করিত। নারীগণকে সর্ব্বদা অবরুদ্ধ ও সাবধান থাকিতে হইবে, নচেৎ পুরুষের হস্তে নারীদিগের নিস্তার নাই, ইহাই তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ছিল। নির্জ্জনে অসহায়া রমণীকে পাইলে, প্রাপ্তমাত্রে তাহাকে ভোগ করিবে, ইহা তাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া মানিত। শত্রুতার প্রতিশোধরূপে শত্রুর স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করা তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল, এবং ঐ দুষ্কর্ম্ম করিবার উদ্দেশে তাহারা নিরীহ অথবা বন্ধু ব্যক্তিদিগেরও সহিত অকারণে শত্রুতা বা কলহ উৎপাদন করিত। এই দারুণ ম্লেচ্ছজাতি ব্যভিচারে এবং পরস্ত্রীহরণে অত্যন্ত আসক্ত ও পটু ছিল। তাহারা যে সকল দেশে রাজত্ব করিয়াছে সেই সকল দেশেই তাহাদিগের অত্যাচারের

অহল্যা উপাখ্যান।

ফলে নারীগণের পরিচ্ছদপরিধানপ্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষের রাজত্ব লাভ করায় হিন্দুসন্তানগণের মর্ম্মে যে কি প্রকার আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। ম্লেচ্ছরাজগণ হিন্দুললনার সতীত্বের মর্য্যাদা কোন কালেই রক্ষা করেন নাই। যাহারা সতীত্বনাশের বিনিময়ে অর্থ লাভ করিলেই সন্তুষ্ট হয় এবং সেই পাপকে ক্ষমার্হ মনে করে, তাহারা হিন্দুনারীর সতীত্বের মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মময়ত্ব কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, এবং কি কারণেই বা উহার সমাদর করিবে অথবা মর্য্যাদা রক্ষা করিবে?

এই রাজত্বের ফলে দুষ্টবীজ অপ্রতিহতভাবে প্রসার পাইয়াছে এবং সমস্ত জগৎকে কলুষিত করিয়া দুষ্ট-সন্তানসন্ততির সৃষ্টি করিয়াছে। বেদে উক্ত আছে যে, মনুষ্যের জন্ম হইতে ধর্ম্মে রুচি তাহার স্বভাবসিদ্ধ। (ঋগ্বেদ—৩-৮-৪)। ইহা সে কালের কথা। একালে মনুষ্যদিগের জন্ম হইতেই অধর্ম্মে রুচি স্বভাবসিদ্ধ। এই জন্যই বোধ হয় অধুনা অধর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয় লাভ করিয়া, সমগ্র ধরার উপর স্বরাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং "বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম" বলিয়া আত্মঘোষণা করিতেছে। "বানরজাতি হইতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে; মনুষ্যত্ব পশুত্বেরই চরম উৎকর্ষ, উহাতে

দেবভাবের কিছুই নাই ; অধিকন্তু মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু সৃষ্টিতে নাই, দেবতাবাদ ও ঈশ্বরবাদ বিশ্বাসযোগ্য নহে" ;—এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ম্লেচ্ছগণের দৌরাত্ম্যের বড়ই অনুকূল হইয়াছে। এই অধর্ম্মরাজ্যের বিস্তারকে যে কোন উপায়ে হউক্ প্রতিহত করিতে না পারিলে, উহার প্রভাবে কালক্রমে এই পৃথিবী একটি নরকে পরিণত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বালবিবাহ ও সতীদাহের অনুমোদন।

এই স্থলে ম্লেচ্ছদিগের দৌরাত্ম্যপ্রসঙ্গে হিন্দুসমাজে বালবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার উৎপত্তির অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

সে কালে অস্ত্রবিদ্যাবিহীন পুরুষ দারপরিগ্রহ করিতে পারিত না ; সুতরাং কাহারও বাল্যাবস্থায় বিবাহ হওয়া কদাচ সম্ভব হইত না। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে, অভিমন্যুর সহিত পরিণয়ের অল্প দিনের মধ্যেই উত্তরার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল ; স্ত্রী প্রাপ্তবয়স্কা না হইলে ইহা হইতে পারে না। একবার স্বামিসুখ অবগত হইয়া বিধবা স্ত্রী আর পুনর্ব্বিবাহের কামনা করিতেন না। বিধবাগণ পতিলোকে গমন করিয়া মৃতপতির সহিত

পুনর্ম্মিলিত হইবার উদ্দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিচর্য্যা পালন করতঃ কালপ্রতীক্ষা করিতেন। সে কালে সহমরণ প্রথা ছিল না। এ কালে দারুণ ম্লেচ্ছজাতির আধিপত্য হেতু হিন্দুদিগের মধ্যে বালবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। দিগ্‌বিজয়ী মুসলমানদিগের অত্যাচারের প্রভাবে এবং ব্রাহ্মণদিগের কঠোর জাতি-বিদ্বেষের ফলে, হিন্দুসমাজের নীচজাতির পুরুষগণ দলে দলে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিত; কিন্তু সেই সংখ্যায় হিন্দুনারীগণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিত না। পরন্তু নীচ-জাতির হিন্দুপুরুষগণ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও, দিগ্‌বিজয়ী মুসলমানগণ তাহাদিগকে কন্যাসম্প্রদান করিতে ঘৃণা বোধ করিত। সুতরাং ঐ শ্রেণীর পুরুষগণ স্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিত না। ইহারই ফলে তাহারা হিন্দু-দিগের অবিবাহিতাকুমারীদিগকে অথবা বিধবানারীদিগকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইত। নীচজাতির লোকগণ স্বভাবতঃ পশুপ্রকৃতি হইয়া থাকে; ধর্ম্মপরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। তাহারা কোন প্রকার ক্ষমতা লাভ করিলেই উহার অপব্যবহার করিয়া থাকে; বিশেষতঃ পরস্ত্রীধর্ষণাদিকর্ম্মেই তাহারা সমধিক আনন্দ লাভ করে। এই হেতু সকল সমাজেই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে কঠোরশাসনে রাখা হয় ও রাখা উচিত।

হিন্দুগণ মুসলমানদিগের উক্তপ্রকার অত্যাচারের প্রতীকারের নিমিত্ত বাদসাহের নিকটে আবেদন করিলে কোন বিচার পাইতেন না। কারণ, বাদসাহগণ সেই শ্রেণীর অত্যাচারীদিগের অবস্থা বুঝিয়া তাহাদেরই পক্ষপাত করিতেন, এবং তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া ঐ প্রকার হরণকর্ম্মকে বিবাহে পরিণত করিতে আদেশ দিতেন। ইহাতে হিন্দুগণ মর্ম্মাহত হইতেন। সুতরাং তাঁহারা ইহা স্থির করিলেন যে, এই অধর্ম্মরাজ্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য হিন্দুদিগের গৃহে অবিবাহিতা কুমারী অথবা বিধবা নারী রাখা হইবে না। ইহারই ফলে হিন্দুসমাজে বালবিবাহ ও সতীদাহ এই দুইটি গর্হিত প্রথার এক সঙ্গে উৎপত্তি হইয়াছে। পুরাকালের ইতিহাসে সতীর দেহত্যাগ, মাদ্রীর সহমরণ ও বালিকা-গৌরীর সম্প্রদান, ইত্যাদির কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সকল ঘটনা কদাচিৎ ঘটিত, এবং সমাজে তৎতৎকর্ম্মের নিমিত্ত কোনপ্রকার প্রথার প্রচলন বা অনুমোদন ছিল না।

সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তন।

সেকালের ঋষিনামক মহাপুরুষদিগের পদ একালে সন্ন্যাসিগণ অধিকার করিয়াছেন। একালের সন্ন্যাস যে

একটি সামাজিক অবনতির ফল তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ বিচিত্র কারণ বশতঃ একালের হিন্দুদিগের অবনতি ঘটিয়াছে। পুরুষগণ অবনতির পথ অবলম্বন করিয়া নারীগণকেও অবনতির পথে লইয়া গিয়াছে। স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা করিবার জন্য এক স্বাভাবিক তেজ ও বল স্ত্রীজাতির মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। ইহাই দুর্গাসপ্তশতী (চণ্ডীপাঠ) গ্রন্থের তাৎপর্য্য, এবং ইহাই দেবীপূজার রহস্য। নারীগণের স্বভাবে পশ্চাৎ যে সকল দোষ উৎপন্ন হয়, পুরুষগণই সেই সকল দোষের জন্য দায়ী। সে কালের তেজস্বিনী সতী নারীগণের প্রবাহ নষ্ট করিয়া, নারীকুলকে ভ্রষ্টাচার-রত করিয়া, পশ্চাৎ নারীজাতির উপর বিরক্ত হইয়া, পুরুষগণ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসমার্গের প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

সন্ন্যাসমার্গ কখনই বেদবিহিত বলা যাইতে পারে না। সে কালে আরণ্য ঋষিগণ সস্ত্রীক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন এবং গৃহস্থগণকেও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। সত্য বটে, বেদে এরূপ উল্লেখ আছে যে, সে কালে কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি অথবা ঋষি অগ্নিচর্য্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের ঐ উল্লেখটি একটি ইতিহাসের বার্ত্তারূপে বলা হইয়াছে; উহা ধর্ম্মের বিধি-

বাক্যরূপে বলা হয় নাই। বেদবাক্যসমূহকে ব্যাকরণসূত্র অনুসারে দেখিতে হয় যে, কোন্ বাক্যটি বিধিবাক্য ও কোন্ বাক্যটি বিধিবাক্য নহে। যথা—

"যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ", অর্থাৎ, মনুষ্য যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে। এই বাক্যে বিধিলিঙ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ঐ কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি বিহিত হইল। "তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংস অগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে", অর্থাৎ, পূর্ব্বে কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেন না। এই বাক্যে কোনরূপ বিধি বিহিত হয় নাই। এই বাক্যোক্ত কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে এরূপ কোন কথাই উঠিতে পারে না। ঐ কর্ম্ম কেহ সাহস সহকারে করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা অপর সকলকেও করিতে হইবে ইহা বলা যাইতে পারে না। সেকালেও কতকগুলি লোক অগ্নিচর্য্যা ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু সেই ত্যাগ বেদের অনুমোদিত কর্ম্ম নহে এবং অপর কোন ব্যক্তির অনুকরণীয়ও নহে। বেদমতে মানবধর্ম্ম কদাচ নিরগ্নি হইতে পারে না।

অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করা, ইহাই মানবজাতির বেদবিহিত সনাতনধর্ম্ম। অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান না করা, ইহাই সন্ন্যাসপদ্ধতির তাৎপর্য্য। অতএব

সন্ন্যাসকে বেদের বিরোধী বলা যাইতে পারে। ঋষিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গগমনের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া এক অভিনব মতের প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, স্বর্গগমনের কোনই আবশ্যকতা নাই, মনুষ্য পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে স্বয়ং ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ণজ্ঞান লাভ করা দেবতাগণের সাধ্য নহে, কিন্তু মনুষ্যের সাধ্য। এই প্রকারে অগ্নিহোত্র ত্যাগ করার একটি প্রত্যক্ষ ফল হইতেছে গোজাতির ধ্বংস। যাহারা মনে করে যে, দুগ্ধের নিমিত্ত গোজাতি পরম উপকারী বলিয়া ঋষিগণ গোহত্যা নিষেধ করিয়াছেন, তাহারা প্রকৃততত্ত্ব জানে না। গোদুগ্ধ অপেক্ষা গর্দ্দভ, ছাগ প্রভৃতি জন্তুর দুগ্ধ মনুষ্যের পক্ষে সমধিক উপকারী। কিন্তু গব্যঘৃতাহুত অগ্নির সহিত দেবদেহগত অগ্নির কোনরূপ সমানজাতীয়তা আছে; সেই গব্যঘৃতাহুত অগ্নিতে দেবতাগণ আকৃষ্ট হইয়া মনুষ্যগণের নিকটে প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হন। এই হেতু বেদে উক্ত আছে যে, দেবতাগণের সহিত গোজাতির ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে, —সেই স্বর্গপথপ্রদাত্রী গোজাতিকে বধ করিবে না। "মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্য

নাভিঃ। মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট ॥" (ঋগ্বেদ —৮-১০১-১৫)।

সন্ন্যাসিগণ অগ্নিহোত্রত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ভারতবর্ষে গোহত্যার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন। যদিও তাঁহারা গোজাতিকে ভক্তি করেন, তথাপি তাঁহাদের সেই ভক্তির কোন ধর্ম্মঘটিত হেতু নাই, এবং সেই জন্যই তাঁহাদের সেই গোভক্তি গোরক্ষা করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং গোহত্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই দায়ী বলা যাইতে পারে। তাঁহারা বৈরাগ্যের ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত ও বহুলপ্রচার দ্বারা হিন্দুদিগের ক্ষাত্রতেজের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষকে ম্লেচ্ছদিগের দৌরাত্ম্যের লীলাভূমি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুনারীগণকে হেয় করিয়া সেই নারীগণপ্রসূত সমগ্র হিন্দুজাতিকেই হেয় করিয়া দিয়াছেন। সন্ন্যাসমার্গের গুরু শঙ্করাচার্য্য স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "নরকের দ্বার নারী"। কিন্তু ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে স্বর্গের সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় স্ত্রীজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ থাকিলেও, উহাতে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে, পুরুষগণ স্ত্রীজাতিকে ক্লেশ দিলে দেবতাগণের কোপে পতিত হয়। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার রচিত পঞ্জরিকাস্তোত্রে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কতক-

গুলি কথা বলিয়াছেন, নিম্নে সেই কথাগুলির মীমাংসা প্রদর্শিত হইতেছে।

"গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে
ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥"

অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ভার্য্যা স্বামীর শবদেহ দেখিয়া ভয় পায় ও তাহা দূর করিয়া লইয়া যাইতে বলে। অতএব স্বামীর প্রতি ভার্য্যার প্রেম মিথ্যা। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য নিজেই উত্তমরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেহ কোন কালেই মমতার উপযুক্ত বস্তু নহে, আত্মাই সেই বস্তু। বস্তুতঃ স্ত্রী নিজ স্বামীর আত্মার অন্বেষণ করে; দেহের অন্বেষণ করা বারাঙ্গনার কার্য্য। পতির শব ভূতলে পতিত থাকে, কিন্তু পতিপ্রাণা সতীর প্রাণ সে দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়াও তাহাতে প্রবেশ করে না, প্রত্যুত উহাকে অবজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃতপতির আত্মার অনুধাবন করিবার নিমিত্ত নিজদেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। ইহা শাস্ত্রোক্ত ও লোকপ্রসিদ্ধ সত্যকথা।

"কা তব কান্তা"।

অর্থাৎ, যাহাকে তুমি এই জন্মে তোমার স্ত্রী বলিয়া মনে করিতেছ, সে কে? সে পূর্ব্বে কোথায় ছিল, পরে কোথায় যাইবে, এবং দেহত্যাগের পর সে কি ভাবে থাকিবে,—এ সকল ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখিলে

জানিতে পারিবে যে, সৃষ্টির বিচিত্র রহস্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। অতএব আচার্য্য বলিতেছেন যে, স্ত্রীকে মিথ্যাবস্তু বলিয়া ত্যাগ কর। কিন্তু ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, সৃষ্টির সকল বস্তুই অচিন্ত্য, অর্থাৎ মনুষ্যের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত। এই সংসার অতীব বিচিত্র—সেই জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে, এরূপ উপদেশের মূলে কোন যুক্তি নাই। মনুষ্য পত্নীর সাহচর্য্যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্রূপ করিবার ফলে মনুষ্য ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিবে এবং মনুষ্যবুদ্ধির অতীত বস্তু সকল বুঝিতে পারিবে। ইহা বেদসম্মত ও যুক্তিযুক্ত কথা।

"নারীস্তনভরনাভিনিবেশম্
দৃষ্ট্বা মা গা মোহাবেশম্।"

অর্থাৎ, নারীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কদাচ রূপের মোহে পতিত হইও না অথবা বিমূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিও না। ইহা উত্তম উপদেশ, সকলেই স্বীকার করিবে। কিন্তু ইহাতে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীত্যাগ করিবার যুক্তি আদৌ নাই। বরং মোহে পতিত না হইলে, স্ত্রীর সঙ্গে একত্র ধর্ম্মকর্ম্ম সকল করিবার বিষয়ে স্বামীর কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহাই করিয়া, পতিপত্নীরূপ মিথুন-সৃষ্টির ধর্ম্মময় উদ্দেশ্য আছে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কর। ইহাই হইতেছে ঋষিদিগের উপদেশ।

অহল্যা উপাখ্যান।

"সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ
পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।"

অর্থাৎ, যৌবনে অপরিমিত স্ত্রীসম্ভোগের ফলে বৃদ্ধবয়সে শরীরে বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। পরন্তু যাঁহারা স্ত্রীকে ক্রীড়ার বস্তু মনে করেন না, প্রত্যুত সহধর্ম্মিণীর সহিত বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধর্ম্মপত্নী হইতে ইহলোকে সুখের ও পরলোকে অমৃতের অধিকারী হন। ইহাই বেদসমূহের তাৎপর্য্য। অতএব উক্ত বাক্যেও স্বামীর পক্ষে স্ত্রীত্যাগ করিবার কোন যুক্তি নাই, স্ত্রীসম্ভোগবিষয়ে সংযমের উপদেশমাত্র আছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, অমৃতও অতিরিক্ত সেবন করার ফলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে; সুতরাং অতিরিক্ত স্ত্রীসেবন করার ফলে শরীরে রোগ জন্মিলে, তজ্জন্য স্ত্রীজাতি নিন্দার্হ হইতে পারে না, অতিরিক্ত সেবনই নিন্দার্হ।

"গেয়ং গীতানামসহস্রম্
ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তম্
দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্॥"

অর্থাৎ, আচার্য্য বলিতেছেন, প্রণয়সঙ্গীত সকল গান না করিয়া বিষ্ণুসহস্রনাম প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করিবে; কামিনীজনের রূপ চিন্তা না করিয়া নারায়ণের মূর্ত্তি ধ্যান

করিবে; স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিদিগের সঙ্গ অন্বেষণ না করিয়া সাধুদিগের সঙ্গ অন্বেষণ করিবে; আর বারাঙ্গনাগণের উদ্দেশে ধন দান না করিয়া দীনদুঃখীদিগের উদ্দেশে ধন দান করিবে। কথাগুলি আচার্য্যের উপযুক্ত; তাঁহার শ্রোতাদিগের জন্য নহে। প্রকৃতির্ নিয়ম খণ্ডন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। ইহা সকলের বিদিত আছে যে, যিনি স্ত্রীর সুখ লাভ করিয়াছেন, তিনিই কামিনীজনের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারেন। নচেৎ, যিনি স্ত্রীর সুখে বঞ্চিত থাকেন, তাঁহার চিত্ত নিয়ত কামিনীচিন্তায় নিমগ্ন থাকারই সমধিক সম্ভাবনা আছে। তিনি নিজের অতৃপ্তবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সাধ্যানুসারে উপায় উদ্ভাবন করিবেন, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই;—আচার্য্যের নিষেধবাক্যগুলি তাঁহার পক্ষে বিফল হইয়া যাইবে। অধিকন্তু, ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ-পূর্ব্বক স্তোত্রপাঠ করতঃ জীবন যাপন করা, এবং ধর্ম্মপত্নীর সাহচর্য্যে যাবজ্জীবন দেবযজন করা, এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ও ঋষিসম্মত তাহা সকলেই বুঝিতে সক্ষম।

"সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ।"

অর্থাৎ, সংসারত্যাগ করিয়া দেবমন্দির ও বৃক্ষমূল প্রভৃতির আশ্রয়ে নিবাস করিবে। আচার্য্য এইরূপ উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু সেই মন্দিরে ও বৃক্ষমূলে

যদি উপাস্যদেবতাদিগের দেবদেবীরূপ যুগলমূর্ত্তি শোভা পায়, তবে উপাসকব্যক্তিদিগেরও পতিপত্নীরূপ যুগলমূর্ত্তি শোভা পাইবে না কেন, ইহা একটি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে কি ? স্বগৃহে থাকিয়া বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই গৃহই দেবস্থান ও পুণ্যারণ্য সদৃশ হয়, এই কথা বেদে, যোগবাসিষ্ঠে, মহাভারতে ও পুরাণ-সমূহে উক্ত আছে, এবং আচার্য্যদেবও তাহা অনেক স্থলে বলিয়াছেন।

"নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্।"

অর্থাৎ, গৃহত্যাগ করিব কি না, এইরূপ বিচার করিতে গেলে কখনই গৃহত্যাগ করা সাধ্য হইবে না ; অতএব আচার্য্য বলিতেছেন, ইতস্ততঃ না করিয়া নিজগৃহ হইতে সত্বর বিনির্গত হইয়া যাও। কিন্তু নিজগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া কোথা যাইবে ? অপরের গৃহে অথবা কোন অরণ্যে যাইতে হইবে, নচেৎ গৃহত্যাগ প্রকারান্তরে আত্মঘাতে পরিণত হইবে। যদি এই ধর্ম্মকেই সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া সকলে গ্রহণ করে, তাহা হইলে এই ধর্ম্মের ফলে, লোকসমূহ পরস্পর পরস্পরের সহিত গৃহ পরিবর্ত্তন করিবে, অথবা লোকালয়সমূহ অরণ্যে ও অরণ্যসমূহ লোকালয়ে পরিণত হইবে ; ইহা সহজেই বোধগম্য করা যাইতে পারে। সুতরাং এই ধর্ম্ম সনাতনধর্ম্ম হইতে

পারে না। ইহা একটি নবীনমতের উদ্ভাবন, যাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে সনাতনধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে। বেদই সনাতনধর্ম্ম ও মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রত্যেকের গ্রহণযোগ্য।

শঙ্করাচার্য্যের মত বেদবিরুদ্ধ হইলেও সেই সময়ের উপযোগী ছিল, নচেৎ ঐ মত এত প্রবলভাবে ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করিতে পারিত না। বস্তুতঃ সেই সময়ে হিন্দুজাতি অবনতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিল, ও নারীগণ ভ্রষ্টাচাররতা হইয়াছিল; এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছ-দিগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ও প্রভাব হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়া একালের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম্মকে ও বেদমার্গকে সম্পূর্ণলোপ হইতে অদ্যাবধি রক্ষা করিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কালপরিবর্ত্তনের হেতু।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পুরাণোক্ত অহল্যার উপাখ্যান প্রভৃতি অশ্লীল গল্পসমূহ একালে রচিত হইয়া সেকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বেদবাক্যসমূহ অবলম্বন করিয়া ও তাহাদের অপরূপ অর্থ করিয়া ঐ সকল গল্প রচিত হইয়াছে। এই প্রকারে লোকবঞ্চনা ও প্রক্ষেপ করা সুসাধ্য হইয়াছে।

এখন একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। যদি সে-কালে হিন্দুজাতির এত উন্নতি হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই জাতির একালে এত অবনতি কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং এইরূপ অনুমান করা যায় যে, হিন্দুজাতি কোনও কালে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই; পুরাণোক্ত গল্পসমূহের আশয় মিথ্যা নহে, অর্থাৎ বাস্তবিকই সেকালে তৎসদৃশ ব্যাপারসমূহ হিন্দুসমাজে বিরল ছিল না। কিন্তু বেদের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইলে কেহই উক্তপ্রকার যুক্তিসমূহকে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবে না। অতএব বলিতে হইবে

যে, ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছদিগের আধিপত্য এবং ম্লেচ্ছশাস্ত্রের ও ম্লেচ্ছাচারের অনুকরণ প্রভৃতি অহিন্দুব্যাপারসমূহই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। পরন্তু এই কথাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে বীজ কদাচ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। হিন্দুজাতি পূর্ব্বেই অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল; তাহা না হইলে ভারতবর্ষে ম্লেচ্ছজাতির আধিপত্যলাভ করা অথবা ম্লেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর হইতে পারিত না। অতএব হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে অন্য কোন যুক্তি অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যখন পুরাণোক্ত জঘন্য গল্পসমূহ রচিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুজাতি অবনতির পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছিল। এ বিষয়ে পুরাণই স্বয়ং প্রমাণস্বরূপ। পুরাণরচনার কাল নির্ণয় করা কঠিন নহে। বেদব্যাস পুরাণসমূহের রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ের লোক ছিলেন, এবং তিনি তাঁহার রচিত মহাভারত নামক গ্রন্থে সেই যুদ্ধের সমসাময়িক বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। বেদশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং গল্পরচনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সদৃশ জ্ঞানিব্যক্তির পক্ষে বেদ অবলম্বন করিয়া পুরাণসমূহের রচনা করা বালকের

ক্রীড়ার ন্যায় তুচ্ছ কার্য্য ছিল। এখন প্রকৃত প্রশ্ন হইতেছে যে, বেদব্যাস বেদোদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্য করিতে গিয়া পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন কেন। এই প্রশ্নের মীমাংসায় কালপরিবর্ত্তনের হেতু অবধারিত হইবে।

লোকক্ষয়।

মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুজাতির মধ্যে সময়ে সময়ে অবনতির লক্ষণ ও বেদবিগর্হিতমার্গের অনুবর্ত্তন দেখা যাইত। বেণরাজা প্রজাবৃদ্ধির কামনায় তাঁহার প্রজা-দিগকে যথেচ্ছপ্রকারে ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পরশুরাম দক্ষিণভারত নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ক্ষত্রিয়াণীদিগকে ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যভিচার করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, যাহার ফলে অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়া থাকে। অবশেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে হিন্দুজাতির যে সমুদায় ক্ষতি হইয়াছিল, অদ্যাবধি সেই সমুদায় ক্ষতির পূরণ হয় নাই। সেই যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে কেবল স্ত্রীসংখ্যাই অবশিষ্ট ছিল, তত্রত্য পুরুষ-গণ যুদ্ধে মৃত হইয়াছিল। দারুণ ম্লেচ্ছজাতিরাও সেই

যুদ্ধে যোগদান করায় কোন কোন প্রদেশে ম্লেচ্ছদিগ-কর্ত্তৃক স্ত্রীগণ অপহৃত হইয়াছিল, তথায় কেবল পুরুষ-সংখ্যাই অবশিষ্ট ছিল। ঐ মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তুর বাসভূমি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যখন সমাজে এতাদৃশ অবস্থা উপস্থিত হয় তখন ব্যভিচারদোষ নিবারণ করা কাহারও সাধ্য হইতে পারে না;—একথা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

"কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥"

অর্থাৎ, লোকক্ষয় হইলে সনাতনধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মই ধর্ম্মে পরিণত হয়; অধর্ম্মের রাজত্ব হইলে কুলবধূগণ ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হয়; এই প্রকারে সঙ্করজাতিসমূহ, অর্থাৎ জারজসন্তানদিগের বংশসমূহ, উৎপন্ন হয়। (ভগবদ্গীতা—১-৩৯,৪০)।

কোন দেশে কোন কারণবশতঃ অস্বাভাবিক লোকক্ষয় হইলে, সেই দেশের অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে এক প্রকার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। ঐ চিত্তবিকারের উদ্দেশ্য

লোকক্ষয়ের পূরণ করা। ঐ চিত্তবিকারের কার্য্য স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত জঘন্য ব্যাপারসমূহে রুচি উৎপাদন করিয়া সেই সমূহকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা, এবং তাহার আনুষঙ্গিকরূপে সমাজে ব্যভিচারকর্ম্ম, মদ্যমাংসাদিসেবন, পশুযাগ প্রভৃতি অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া। ইহা সর্ব্বদেশের পণ্ডিতদিগের স্থিরসিদ্ধান্ত। (Brown : Sex Worship and Symbolism ; the last portion,—Interpretations). অধুনা য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে সেই মহাদেশে উক্তসিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষেও ঐরূপ সামাজিক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধকেই হিন্দুজাতির অবনতির প্রকৃত কারণ, ও ভারতবর্ষে বেদবিরুদ্ধমার্গের প্রবর্ত্তনের হেতু, বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্যাসদেবের সময়কে দুই অংশে বিভক্ত করা যায়; পূর্ব্বাংশ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বে, এবং অপরাংশ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে। পূর্ব্বাংশে তাঁহার নাম বাদরায়ণ, এবং অপরাংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বাদরায়ণের সময়ে হিন্দুগণ অবনতির পথে অধিক অগ্রসর হয় নাই, তখনও বেদেরই প্রভাব ছিল। কারণ, বাদরায়ণ তৎকাল-প্রচলিত বেদের সংশোধন করিবার মানসেই বেদসমূহকে

একত্র করিয়া চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; এই হেতুই তিনি বেদব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। জ্ঞান-কাণ্ডকে ব্রহ্মসূত্রে সংক্ষিপ্ত করিয়া, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইহা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পূর্ব্বের কথা। সেই মহাযুদ্ধের পরে সমাজে যেরূপ অবস্থা, ও সেই অবস্থানুসারে যেরূপ রুচি, উৎপন্ন হইল, তাহাতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেখিলেন যে বেদসংশোধনের নিমিত্ত চেষ্টা করা বৃথা। তিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে দেখিলেন যে, অবস্থানুসারে ব্যবস্থা না করিলে হিন্দুগণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত অচিরাৎ সংমিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং সমগ্র হিন্দুজাতির হিন্দুত্বই লোপ পাইবে। সেই হেতু তিনি হিন্দুদিগের স্বতন্ত্রতা ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মহাভারত ও পুরাণসমূহ প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে এক নূতন ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন। ঐ পুরাণসমূহ সেই সময়ের লোকের রুচি এবং সেই সময়ের সমাজের আবশ্যকতা অনুসারে রচিত হইয়াছিল। ঐ সমূহে স্ত্রীপুরুষঘটিত জঘন্যব্যাপারসমূহ ধর্ম্মকথার সহিত গ্রথিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অধর্ম্মকে ধর্ম্মের আশ্রয় দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, বিবাহবন্ধনকে শিথিল করিয়া এবং ব্যভিচারদোষকে ক্ষমার্হ করিয়া, লোকক্ষয়ের পূরণ করা। এই প্রকারে পৌরাণিকধর্ম্মের প্রবর্ত্তন দ্বারা

অহল্যা উপাখ্যান।

হিন্দুদিগের মধ্যে নানাবর্ণের ও নানাজাতির উৎপাদন করিয়া, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভারতবর্ষের লোকসমূহকে সম্পূর্ণ লোপ হওয়ার উপক্রম হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

লোকক্ষয় হইলে তাহার পূরণের প্রবৃত্তি স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। তখন পার্থিববাসনার সংযম অথবা ক্ষয় করিয়া স্বর্গের প্রতি ধাবিত হইতে কাহারও ইচ্ছা হয় না; যাহাতে পৃথিবীর উন্নতি হয় সেই বিষয়ে সকলের চিত্ত আপনা হইতেই নিবিষ্ট হয়। যে সমুদয় দুষ্কর্ম্ম অস্বর্গীয়, অর্থাৎ মনুষ্যের স্বর্গগমনের অবরোধক, সেই সমুদয়ে তখন লোকসমূহের প্রবৃত্তি জন্মে; মৃত্যুর পর তাহারা মর্ত্ত্য-লোকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাসনা করে, স্বর্গলোকের কথা শুনিতেও তাহাদের অরুচি হয়। তখন বাসনার পোষণ করিতে ও ভোগদ্বারা বাসনার তৃপ্তি করিতে সকলের প্রবৃত্তি হয় এবং সেই প্রবৃত্তির অনুকূল উপদেশে ও কর্ম্মে সকলের রুচি হয়। ইহাই পৌরাণিকধর্ম্মের উৎপত্তির মূলকারণ। এই কারণবশতঃ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে হিন্দুদিগের পৌরাণিকধর্ম্মে এত অভিরুচি হইয়াছিল যে, অদ্যাবধি সেই রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে না, যদ্যপি এখন আর সে রুচির কোন নৈসর্গিক বা সামাজিক আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাই অহল্যা উপাখ্যানের প্রকৃত রহস্য।

বাণিজ্যবিস্তার।

পুরাণসমূহ যে কেবল বেদ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, তাহা নহে। তৎকালে ম্লেচ্ছদিগের ধর্ম্মের যে সকল প্রথা ও কথা হিন্দুদিগের আচারব্যবহারে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, সে সকলও পুরাণের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া একালের হিন্দুধর্ম্মে অনেকপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে অসুর নামক ম্লেচ্ছজাতি ও সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত "পণি" নামক বণিক্‌সম্প্রদায় পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষে অতিথিরূপে আগমন করিত। পণিগণ "গোঘ্ন অতিথি"দিগের শ্রেণীভুক্ত ছিল; কারণ তাহারা গোহত্যা করিয়া গোমাংস ভক্ষণ করিত এবং গোশরীরজাত বস্তুর সাহায্যে গোদুগ্ধ হইতে "পণির" (ছানা) নামক খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিত। এইজন্যই ছানা প্রস্তুত করা বা ভোজন করা বা দেবকর্ম্মে প্রয়োগ করা হিন্দুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পণিগণ হিন্দুদিগের ন্যায় দেবপূজক ছিল; কিন্তু তাহারা দেবতাগণকে ব্যভিচার-পরায়ণ অথবা মনুষ্যের অহিতকারী বলিয়া কল্পনা করিত, এবং দেবতাপূজাপ্রসঙ্গে অতি জঘন্য ব্যভিচারের ও বীভৎস প্রাণিবধের অনুষ্ঠান করিত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, পণিগণ ঋষিদিগের যজ্ঞে বিবিধবিঘ্নের উৎপাদন করিত বলিয়া ঋষিগণ ইহাদের উপর তীব্রমন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "পণিগণ চিরকালের নিমিত্ত দূর হইয়া যাক্; এবং গোগণ যজ্ঞদ্বারা পুনরায় সম্মান প্রাপ্ত হউক্।" (ঋগ্বেদ—১০-১০৮-১১)। "অবোধ (ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য) পণিগণ চিরনিদ্রা গমন করুক্।" (ঋগ্বেদ—১-১২৪-১০)।

হিন্দুগণ স্বভাবতঃ পরধর্ম্মীগণের সহিত সখ্য করিতে ভালবাসে। পণিগণের সহিত সখ্যভাব স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দুগণ পণ্যকন্যাগ্রহণ, গোমেধের অনুমোদন, দেবতাগণের সম্বন্ধে জঘন্য গল্পের প্রচলন, পূজাপ্রসঙ্গে জীববলির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মকে স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। একালে কার্ত্তিকসংক্রান্তির উৎসবে যে "ইতুপূজা" (মিত্রপূজা অর্থাৎ সূর্য্যপূজা) করা হয়, তাহা হিন্দুগণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ পূজা ব্যভিচারের অনুমোদক বলিয়া ম্লেচ্ছদেশসমূহে বিশেষ সমাদৃত হইত। হিন্দুগণও নারীর সংমিশ্রণে ঐ পূজা করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা এবং রাসলীলাও কোন হিন্দুশাস্ত্রে নাই, হিন্দুগণ ম্লেচ্ছাচার হইতে ঐসকল গ্রহণ করিয়াছে। লিঙ্গপূজাও তদ্রূপ। সে কালের হিন্দুগণ লিঙ্গপূজা জানিতেন না। বেদসমূহে

উহার কোনও কথা নাই; বরং ঋগ্বেদে "শিশ্নদেব" (লিঙ্গোপাসক) দিগকে দূর করিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ম্লেচ্ছগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে লিঙ্গপূজা করিত। তাহারাই ভারতবর্ষে উহার প্রচার করিয়াছিল। তাহাদের লিঙ্গোপাসনায় যে সকল গুপ্ত ক্রিয়া ছিল, সে সকল ব্যভিচারের প্রবর্ত্তক ও অনুমোদক। তাহাদের সেই "আসুরীবিদ্যা" এখন হিন্দুদিগের কতকগুলি নিকৃষ্টতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

পুরাণ, কোরাণ, ও বাইবেল এই তিনটি সমানজাতীয় গ্রন্থ। এই তিন গ্রন্থেই প্রাচীনকালের ম্লেচ্ছদিগের গল্প ও আচার সমূহকে, ধর্ম্মকথার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া, লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে পূর্ব্বোক্ত সামাজিক কারণবশতঃ পুরাণসমূহে ম্লেচ্ছাচারকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। অধুনা ম্লেচ্ছগণ তাহাদের প্রাচীন আচার ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবীন মত গ্রহণ করিয়াছে, এবং সেই হেতু হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। নচেৎ, সকলধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াই পুরাণের সঙ্কলন করা হইয়াছিল, পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত প্রাচীনম্লেচ্ছদিগের ধর্ম্মের কোনই বিরোধ ছিল না। বেদ, অর্থাৎ হিন্দুদিগের সনাতনধর্ম্ম, চিরকালই ম্লেচ্ছাচারের বিরোধী, ইহাতে কোনই সন্দেহ

নাই। বেদই মানবজাতির স্বধর্ম্ম,—সকলেরই স্বভাবে প্রোথিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধার।

"হিন্দুগণ অধঃপাতে গিয়াছে", এই কথা সকল হিন্দুই বলিয়া থাকে, কিন্তু কেহই হিন্দুগণের যাহাতে পুনরায় অভ্যুদয় হয় তাহা করে না। যদি দৈবাৎ কেহ করে, তাহা হইলে হিন্দুগণ তাহাকে "মহাত্মা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার গুণ গান করে, কিন্তু কেহই তাহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে না। যদি মহাত্মার ন্যায় সকলেই নিজ নিজ অভ্যুদয়ের জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে সমগ্রজাতির অভ্যুদয় হয়।

হিন্দুরাজার সহিত যুদ্ধে যবনরাজার জয়লাভ করিবার আশা কোনকালেই ছিল না,—মহাবীর আলিসেকেন্দারেরও ছিল না। কিন্তু যুদ্ধকালে হিন্দুদিগের রাজা মৃত বা ধৃত হইলে হিন্দুসেনাগণ আর যুদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিত না, সুতরাং যবনগণ অবলীলাক্রমে হিন্দুদিগের দেশ অধিকার করিত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ আত্মনির্ভর করিয়া স্বদেশের অথবা স্বরাজের জন্য যুদ্ধ করে না, তাহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করে।

স্বদেশ-আন্দোলন ও স্বরাজ-আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। স্বধর্ম্ম-আন্দোলন অবশিষ্ট আছে। হিন্দুগণের স্বভাব ধর্ম্মপ্রবণ; সুতরাং আশা করা যায় যে, স্বধর্ম্ম-আন্দোলন দ্বারাই তাহাদিগের অভ্যুদয় হইবে। বেদসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইদানীন্তনকালের ন্যায় পুরাকালেও ম্লেচ্ছজাতিগণ বিদেশীয় ফলমূল, চীনাংশুকপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সুন্দরীকুমারী, মর্ম্মরনির্ম্মিত-প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের নিকটে বিক্রয়ার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিত; কিন্তু তৎকালে হিন্দুদিগের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবল থাকার হেতু কেহ ভারতবর্ষকে জয় করিবার কথা কখন স্বপ্নেও মনে করিতে পারিত না।

অতঃপর স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার নিরূপণ করা যাইতেছে। অমরদিগের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করা, ইহাই মনুষ্যজাতির স্বধর্ম্ম। মনুষ্যের অমরত্বলাভ, ইহাই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল। ঐ অনুষ্ঠানের জন্য যজ্ঞাগ্নির ও গব্যঘৃতের প্রয়োজন আছে, এবং দিব্যচরিত্রবান্ উপাসকের আবশ্যকতা আছে। অনেকে বলে যে, এ যুগে আর ঐ সকল সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং হিন্দুদিগের পক্ষে অন্যান্য বিধর্ম্মীজাতির সহিত একীভূত হইয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর। এইপ্রকার ধারণা ভ্রান্তিমূলক। হিন্দুর

তেজের লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মের এখনও লোপ হয় নাই। এখনও হিন্দুরমণী ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে; এখনও দেবচরিত্র নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণে হিন্দুর প্রগাঢ় ভক্তি আছে; এখনও গোরক্ষা করা হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত আছে। এখনও নির্ব্বাণপ্রাপ্তির ইচ্ছা অপেক্ষা অমরত্বলাভের ইচ্ছাই হিন্দুদিগের অন্তঃকরণে প্রবলতরভাবে বিরাজ করিতেছে। এখনও দেবলোকে গমন করিবার কামনায় হিন্দুগণ দেবতার প্রতিমা পূজা করিয়া, দেবতাদর্শনের জন্য প্রযত্ন করিতেছে। এখনও হোম, আরতি, অথবা দীপদান প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে যজ্ঞাগ্নিই সনাতনধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ প্রকারান্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অগ্নির বিধিপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারাই হিন্দুদিগের অস্তমিত তেজ পুনরায় অভ্যুদয় লাভ করিবে, ইহা বেদের ও ঋষিকুলের অব্যর্থ বচন ও অঙ্গীকারস্বরূপ। অগ্নির বিধিপূর্ব্বক উপাসনার জন্য মন্দিরসমূহের সংস্কার করা আবশ্যক। মন্দিরসংস্কার কোন দুরূহ কার্য্য নহে, প্রত্যুত উহা অতি সহজ কার্য্য।

মন্দিরসংস্কার।

দেবতার উদ্দেশ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়, সেই অগ্নির নিমিত্ত বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য

বিহিত নহে। তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে, হোম, আরতি, দীপদান প্রভৃতি সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যায়। অধুনা বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া গিয়াছে; মেদ ও বসা (চর্ব্বি) মিশ্রিত ঘৃত, অথবা ঘৃতের অনুরূপ অন্য কোন পদার্থ, ঘৃত বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুগণ তাহাই দেবকর্ম্মে প্রয়োগ করিতেছে। ইহাতে সুফল না হইয়া কুফল হইবারই কথা। ধর্ম্মের এই প্রধান অঙ্গটিকে হিন্দুরা এখন বড়ই অগ্রাহ্য করে। মুসলমানগণ খাদ্যদ্রব্যে চর্ব্বির ব্যবহার করে বলিয়া হিন্দুগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করে। মুসলমানগণ কিন্তু তাহাদের পীরের কবরে যে দীপ দান করে, তাহাতে তাহারা কোন মৃতজীবের দেহগত পদার্থের সংমিশ্রণ করিতে দেয় না। সুতরাং ধর্ম্মকর্ম্মে হিন্দুগণ এখন মুসলমানগণের সমকক্ষ নহে বলিতে হইবে। হিন্দুগণের এখন প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে দেবপূজামাত্রের নিমিত্ত বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের আয়োজন করা; নচেৎ পূজাপাঠ ত্যাগ করাই তাহাদের শ্রেয়স্কর। কিন্তু ইদানীং গোহত্যার ফলে ঘৃতের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক মন্দিরে অথবা প্রত্যেক গৃহস্থগৃহে বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের ব্যবস্থা করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং একটি স্বতন্ত্র "হোমমন্দির" প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ঘৃত।

এই মন্দিরের সম্পর্কে একটি গোশালা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বসমক্ষে গোদুগ্ধদোহন করিয়া তাহা হইতে সদ্যঃ নবনীত উদ্ধৃত করতঃ ঘৃত প্রস্তুত করিয়া সেই ঘৃতদ্বারা হোমকর্ম্ম নিষ্পাদন করা উচিত। বেদে উক্ত আছে, "গোগণ দুগ্ধদোহনের সময় হইলে স্বয়ং আসিয়া মন্দিরে দোহনার্থ উপস্থিত হয়; নবীনঘৃতদ্বারা সুচারুরূপে হোম করিলে দেবতাগণ উপাসককে অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত করান।" (ঋগ্বেদ—১-১৭৩-১ ; ৮-৩৯-৬)।

গোরক্ষার বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ না হইলে হিন্দুগণ কদাচ হোমমন্দির রক্ষা করিতে পারিবে না। বেদে উক্ত আছে যে, "পূর্ব্বে বৃষ ও ধেনুর আয়োজন করিতে হইবে"। গোশালা মন্দিরের সংলগ্ন হউক্ বা মন্দির হইতে দূরে হউক্, তাহার ভূমি নিষ্করদেবোত্তরসম্পত্তি হওয়া আবশ্যক। গোদোহনকর্ম্ম স্বয়ং ব্রহ্মচারী ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক করা উচিত, কদাচ উপদংশাদি-রোগদুষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক করা উচিত নহে। কারণ, ঐপ্রকারের অনিয়মে গোশরীরে গুটিকা প্রভৃতি রোগ প্রবেশ করে, এবং কালে সেই গো হইতে কোন বৃষে এবং ঐ বৃষ হইতে আবার অন্যান্য গোগণের শরীরে সংক্রামিত হয়। এইপ্রকারেই গোজাতির অবনতি ঘটে এবং তন্নিবন্ধন ঘৃতদুগ্ধাদি ক্রমশঃ নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন হইতে

গো।

থাকে। গোজাতির উন্নতিসাধনের নিমিত্ত উত্তম বৃষকে হোমমন্দিরে রক্ষা করা উচিত। এই সকল কথা ঋগ্বেদের উক্তি অনুসারেই কথিত হইল। "পূর্ব্বে আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ।" "উপেদম্ উপপর্চ্চনম্ আসু গোষু উপ পৃচ্যতাম্। উপ ঋষভস্য রেতসি উপেন্দ্র তব বীর্য্যে॥" (ঋগ্বেদ—১০-৫-৭; ৬-২৮-৮)।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুমাত্রের এই মন্দিরে প্রবেশাধিকার আছে। পরন্তু মন্দিররক্ষকব্রাহ্মণদিগের বিশেষত্ব রক্ষা করা উচিত; কারণ, যেমন ব্যাঘ্র রক্ষিত হইয়া বনকে রক্ষা করে, তেমন ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করে; ইহা মহাভারতের উক্তি। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বিহিত গুণ অনুসারে জনগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টকালের জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন। বেদে এইপ্রকার ব্রাহ্মণনির্ব্বাচনপদ্ধতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। "এবম্বিদং সুব্রহ্মণ্যং (ব্রহ্মাণং) কুর্ব্বীত নানেবম্বিদম্।" (ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ—১-২; ছান্দোগ্য-উপনিষৎ—৪-১৭-১০)।

ব্রাহ্মণ।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতাসমূহের উপাসকগণ, একই হোম-মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক হোম করিবে। স্বকীয় ইষ্টদেবতাকে নিজগৃহে অথবা সেই দেবতার মন্দিরে পূজা করিয়া, পূজাসমাপনান্তে প্রত্যেক হিন্দুব্যক্তি হোমমন্দিরে আগমন-

পূর্ব্বক হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে। পূজা শেষ করিবার অব্যবহিত পরে হোম না করিয়া, তাহার কিয়ৎকাল পরে হোম করা বিহিত আছে।

হোম।

হোমমন্দিরে কোনপ্রকার চিত্র অথবা প্রতিমূর্ত্তি থাকিবে না; উপাসকব্যক্তি নিজ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করতঃ হোম করিবে। এই সকল নিয়ম বেদকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েদ্ বষট্ করিষ্যন্।" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩-১১-৮-১)।

স্ত্রীজাতির হোমে অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রসম্মত কথা। কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ, ধর্ম্মকর্ম্মে স্ত্রীপুরুষগণ একত্র সমবেত হইলে উভয়পক্ষে ধর্ম্মবিষয়ে মনোনিবেশ করার পথে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

অতঃপর হোমমন্দিরের সংস্কার করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে। লিঙ্গমন্দিরের নিম্নদেশে যোনিপীঠে লিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। সেই লিঙ্গকে বিধিপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া যোনিকে গব্যঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিবে। সেই যোনিসংলগ্ন বেদিস্থলে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকিবে। শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সেই অঙ্গারাগ্নি অরণিদ্বয়ের প্রমথন হইতে উৎপাদিত হওয়া উচিত। ঐ অঙ্গারসমূহকে বাতাহত করিলে তাহাদিগ

যোনিপীঠ।

হইতে অগ্নি উত্থিত হইবে। সেই অঙ্গারোত্থ অগ্নির সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোনিকুণ্ডস্থ উত্তপ্ত ও ধূমায়িত ঘৃত স্বয়ং প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। ইহাই বিশুদ্ধ অগ্নি, যাহাকে যজ্ঞাগ্নি বা হোমানল বলে, যাহা দেবতার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। "বেদিষদে প্রিয়ধামায় প্রভরা যোনিমগ্নয়ে। শুচিং জ্যোতীরথং শুক্রবর্ণং তমোহনম্॥" "আ যোনিম্ অগ্নির্ঘৃতবন্তম্ অস্থাৎ।" "অগ্নে তব যোনিং ঘৃতবন্তম্ আসদঃ।" (ঋগ্বেদ—১-১৪০-১ ; ৩-৫-৭ ; ১০-৯১-৪)"।

উক্ত প্রকারে যোনিপীঠের পাষাণময়লিঙ্গকে অপসারিত করিয়া, তাহার স্থানে জ্যোতির্লিঙ্গের প্রবর্ত্তন করিবে। হোমাগ্নিই সেই জ্যোতির্লিঙ্গ ; উহাকে পুরাণে দেবতাগণের উৎপত্তির আদিকারণ বলা হইয়াছে। এই অগ্নিকেই ঋগ্বেদে "শুচিপ্রতীক" ও "ঘৃতপ্রতীক" বলা হইয়াছে। বিশুদ্ধ অগ্নি কেবল ঘৃতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই ; তাহাতে কাষ্ঠখণ্ড অথবা বর্ত্তিক প্রভৃতি কোন দ্বিতীয় বস্তুর গন্ধের লেশমাত্র থাকিলে সেই অগ্নিকে বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কালক্রমে গব্যঘৃত দুষ্প্রাপ্য হওয়ার ফলে অল্পঘৃতদ্বারা হোমকর্ম্ম সুনিষ্পন্ন করিবার জন্য কাষ্ঠবর্ত্তিকাদির প্রয়োগ কল্পিত হইয়াছে। নচেৎ, যখন কেবল ঘৃত ও অগ্নির

জ্যোতির্লিঙ্গ।

সংযোগে যজ্ঞাগ্নির উৎপাদন করা সম্ভব, তখন কোন মধ্যস্থ বস্তুর আবশ্যকতা হইবার অন্য কোনও কারণ থাকিতে পারে না। এই বিষয়েও বেদবাক্য প্রমাণ। "ঘৃতং মিমিক্ষে ঘৃতমস্য যোনির্ঘৃতে শ্রিতো ঘৃতম্ উ অস্য ধাম।" "ঘৃতপ্রতীকঃ অগ্নিঃ।" (ঋগ্বেদ—২-৩-১১; ৩-১-১৮)।

যেমন যোনিপীঠস্থ পাষাণলিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গে পরিবর্ত্তিত করিবে, তেমন মন্দিরের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত জলকুম্ভকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থানে ঘৃতকুম্ভের স্থাপন করিবে। যেমন পূর্ব্বে পাষাণময় শিবলিঙ্গের উপরি কুম্ভ হইতে জলধারা পতিত হইত, তেমনই এখন অগ্নিময় জ্যোতির্লিঙ্গের উপরি কুম্ভ হইতে ঘৃতধারা পতিত হইবে, এইপ্রকার ব্যবস্থা করিবে। বেদে উক্ত আছে, "প্র ভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারাম্" (অথর্ববেদ—৩-১২-৮)। প্রয়াগক্ষেত্রসমূহে অর্থাৎ প্রকৃষ্টযাগক্ষেত্রসমূহে ঘৃতকুম্ভসংগ্রহ করিয়া হোমের নিমিত্ত রক্ষা করাই প্রাচীন কালের কুম্ভমেলা ছিল, যাহা এখন নামমাত্রাবশিষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে। ঘৃতধারা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে ৫৮ সূক্তের ৫ হইতে ৮ মন্ত্রসমূহ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

কুম্ভ।

এই প্রণালীদ্বারা হোমাগ্নিকে নিরন্তর প্রজ্বলিত

রাখিয়া উহাকে অনির্ব্বাপিত রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়।

হোমদ্রব্য। যোনি ঘৃতে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে, যোনি হইতে পতনশীল ঘৃতের ধারণ করিবার জন্য পাত্রাদি মন্দিরে রক্ষা করা আবশ্যক। আর, যোনিতে ঘৃতের হ্রাস হইতে থাকিলে, কুম্ভ হইতে ক্ষরণশীল ঘৃতধারার সহিত, জুহূ হইতেও ঘৃতধারা যোনিতে বর্ষণ করিতে হইবে। এই প্রকার বিধি শাস্ত্রে আছে।

• যোনিপীঠের নিম্নদেশে ভূগর্ভে শূন্যস্থান থাকা নিষিদ্ধ, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বেদে, "দক্ষপুরুষ কর্ত্তৃক অদিতির উপস্থে জন্মিত" অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের সন্ধিস্থলে হোমাগ্নি উৎপাদিত করিবার যে বিধি আছে, তাহার ইহাই তাৎপর্য্য। (ঋগ্বেদ—১০-৫-৭)।

সংস্কৃতমন্দিরের অন্তর্ভাগের বর্ণন করিয়া, তাহার বহির্ভাগের বর্ণন করা যাইতেছে। মন্দিরের চূড়া অগ্নিশিখার সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া বিহিত। মন্দির-

শিখা। রক্ষকব্রাহ্মণগণ অগ্নিহোত্রীর চিহ্নরূপে মস্তকে কেশরচিত শিখা ধারণ করিবেন। সভামধ্যে কদাচ ঐ শিখা প্রদর্শন করা উচিত নহে, কিন্তু মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিয়া শিখা গোপিত করিয়া রাখা উচিত। এই সভ্যতার নিয়ম অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া

আসিতেছে। দেবযজনকারী ব্যক্তি উপবীত, এবং পিতৃ-যজনকারী ব্যক্তি প্রাচীনাবীত ধারণ করিয়া থাকিবেন। (কৌশিকসূত্র—১-১১, ১২)। পাষাণনির্ম্মিত নন্দি-বৃষকে অপসারিত করিয়া তাহার স্থানে একটি সন্তানোৎ-পাদনক্ষম জীবিত বৃষের উপবেশনের নিমিত্ত আসন প্রস্তুত করা উচিত। এবং সেই মন্দিরের

বৃষাসন।

প্রাঙ্গনে কতিপয় সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী রক্ষা করিবার জন্য একটি গোষ্ঠ থাকা উচিত। গোদোহনের সময় উপস্থিত হইলে শঙ্খধ্বনি দ্বারা গোসকলকে এবং জনসাধারণকে আহ্বান করা আবশ্যক, এই হেতু মন্দিরে শঙ্খস্থাপন করিতে হয়।

শঙ্খস্থাপন।

কিন্তু অন্য কোন সময়ে কোনও বাদ্যাদির ধ্বনি মন্দিরে শ্রুত হওয়া উচিত নহে। দেবতাগণ হোমাগ্নি দ্বারা আকৃষ্ট হন; নৃত্যগীতবাদ্যাদি দ্বারা তাঁহারা আকৃষ্ট হন না। ধর্ম্মকর্ম্মে ঐ সমূহের কোনই তাৎপর্য্য নাই। ওঁকারের অনুরূপ বলিয়া শঙ্খধ্বনি ধর্ম্মকর্ম্মে সমাদৃত হয়।

মন্ত্রপাঠ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ মন্দিরে শ্রুত হওয়া উচিত নহে। পরন্তু মন্ত্রপাঠ উচ্চৈঃস্বরে না করিয়া, মনে মনে নিঃশব্দে করিলেই সমধিক ফলপ্রদ হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। দেবযজনকর্ম্মে অগ্নি ও ঘৃত এই দুইটি

হইতেছে মুখ্য সামগ্রী; মন্ত্রজপ করা কেবল চিত্তের একাগ্রতাসাধনের নিমিত্ত। ধ্যানে চিত্ত স্থির হইলে মন্ত্রজপ করা আবশ্যক হয় না, এবং তখন তাহা করা সম্ভবপরও হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া যজ্ঞাগ্নিকে অনির্ব্বাপিত রাখিলে, সেই অগ্নিমধ্যে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়; ছয় ঋতু (অর্থাৎ এক বৎসর) ব্যাপিয়া অগ্নিকে অনির্ব্বাপিত রাখিলে, দেবতার অনুগ্রহে ইষ্টবস্তুর লাভ হয়। এক ঋতু ঐ প্রকার করিলে, সাধকব্যক্তির হৃদয়ে নির্ভয়তা, বল, বীর্য্য ও তেজের আবির্ভাব হয়। পরন্তু হোমাগ্নিকে নিরন্তর অনির্ব্বাপিত রাখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, ও সায়ংকাল, এই তিনটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ তিনবার উহা প্রজ্বলিত করিতে হয়, ইহাই বেদের বিধান। (ঋগ্বেদ—৩-৪-২)। বিশেষতঃ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রজ্বলিত করিয়া সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পর পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত রাখা, ইহাই হোমাগ্নি প্রজ্বলন করার শ্রেষ্ঠ বিধান। ইহার নাম "প্রাতর্দীপন"। প্রাতর্দীপনকারী ব্যক্তি শুচি অশুচি প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় দিবারাত্র অগ্নিমন্ত্রের মানসজপের অনুষ্ঠান করিবে। (ঋগ্বেদ—১-১-৭)। "অগ্নয়ে নমঃ" (তন্ত্রমতে "অং অং অগ্নয়ে নমঃ") এই অগ্নিমন্ত্র স্বয়ং বেদমুখে বিহিত

হইয়াছে। (ঋগ্বেদ—৫-৬০-১ ; শুক্লযজুর্ব্বেদমাধ্যন্দিন-সংহিতা—১৩-৪৩ ; ২৩-১৩ ; কঠসংহিতা চরকশাখা—১১-১ ; ২-১৩ ; শতপথব্রাহ্মণ—১৩-২-৭-৭ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক—১০-১-১২ ; ঈশাবাস্যোপনিষৎ—১৮ ; লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র—৯-২৫-১ ; মানবগৃহ্যসূত্র—২-১২-৩)।

সমাজসংস্কার।

স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য সামাজিক কুসংস্কারসমূহকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এই কুসংস্কার-সমূহের মধ্যে প্রতিমাপূজা, হিংসাবাদ, জ্যোতিষদর্শন ও জাতিবিদ্বেষ, এই কয়টি এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রতিমা। যে কালে যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হইত, সে কালে দেবতার প্রতিমাপূজা প্রচলিত ছিল না। যজ্ঞাগ্নির লোপ হওয়ার জন্য দেবতাগণ আর মনুষ্যের প্রত্যক্ষ হন না। তদবধি মনুষ্যগণ দেবতাদিগের প্রত্যক্ষদর্শনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতিমানির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। এই কথা বোধগম্য করা কঠিন নহে।

যাবৎকাল দেবতাগণ মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত না হইবেন, তাবৎকাল মর্ত্ত্যগণ দেবতার

প্রতিমাস্থাপন ও প্রতিমাপূজন সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা সুনিশ্চিত। যাহাদের ধর্ম্মে প্রতিমাপূজা নিষিদ্ধ, তাহারাও প্রকারান্তরে প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে। প্রতিমাপূজা সম্পূর্ণ লোপ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে যজ্ঞাগ্নির পুনঃপ্রবর্ত্তন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত যজ্ঞাগ্নির মধ্যে দেবতার প্রত্যক্ষদর্শন ঘটিবে না, সে পর্য্যন্ত হিন্দুগণ প্রতিমাপূজা ত্যাগ করিবে না। অতএব যজ্ঞাগ্নির পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রারম্ভে, হিন্দুগণ যথাতথা প্রতিমাপূজা করিয়া, পশ্চাৎ হোমমন্দিরে আসিয়া তথায় হোমকর্ম্ম করিতে পারে। এইপ্রকার করিলে যজ্ঞাগ্নির প্রভাবে প্রতিমাপূজা স্বতই লুপ্ত হইতে থাকিবে, এবং দেবমন্দিরসমূহ হোমমন্দিরে পরিণত হইতে থাকিবে।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদের সময়ে অগ্নির জন্য কোনরূপ মন্দির ছিল না; গৃহে গৃহে অগ্নির রক্ষা করা হইত, এবং উন্মুক্তভূমিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইত। এই কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যে কালে অগ্নিই মনুষ্যসমূহের উপাসনার একমাত্র বস্তু ছিল, সে কালে অগ্নির জন্য মন্দির ছিল না, ইহা হইতে পারে না। হিন্দু-ভিন্ন অন্যান্য জাতিরাও অগ্নির উপাসনা করিত; তাহাদের সকলেরই যে অগ্নিমন্দির ছিল, অদ্যাপি তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। এমত অবস্থায়, কেবল হিন্দুগণ

অগ্নির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিত না, এরূপ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। ঋগ্বেদের প্রথমসূক্তে যজ্ঞাগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, "বর্দ্ধমানং স্বে দমে," অর্থাৎ "স্বীয় গৃহে বর্দ্ধমান (প্রজ্বলিত)।" এই বৈদিক দমশব্দ হইতেই য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে মন্দিরার্থবোধক "ডোম" (dome) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব হিন্দু-দিগের অগ্নিমন্দির ছিল না, এইকথার কোনই যুক্তি নাই। পরন্তু আধুনিক লিঙ্গমন্দির প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন অগ্নিমন্দিরের পরিবর্ত্তিত অবস্থা কি না, ইহা প্রশ্ন করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বেদে লিঙ্গ-পূজার কোন কথা নাই। ম্লেচ্ছগণ চিরকাল হইতেই লিঙ্গের উপাসনা করিত। পৌরাণিকধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সময়ে হিন্দুগণ ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতে লিঙ্গোপাসনা গ্রহণ করিয়াছিল, এবং সেই সময়েই ব্যাসদেব লিঙ্গ-পুরাণ রচনা করিয়া লিঙ্গপূজাকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

যোনি শব্দের অর্থ উৎপত্তিস্থান; কোন বস্তুর উৎপত্তি-স্থানকে সেই বস্তুর যোনি বলে। বৈদিকপ্রয়োগে ঘৃত-কুণ্ডকে যোনি বলে; কারণ উহাই হোমাগ্নির উৎপত্তিস্থান। ঐ যোনি সাধারণতঃ ত্রিকোণাকারে নির্ম্মিত হয়; ইহার কারণ এই যে, অন্যান্য আকৃতির অপেক্ষা ত্রিকোণাকৃতির

যোনিতে অল্প ঘৃত দ্বারা হোমকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, উহাতে সমপরিমাণ ঘৃত অধিককাল প্রজ্বলিত থাকে। স্ত্রীলিঙ্গের সহিত উহার আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই। লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন; কোন বস্তুকে অনুমান করিবার চিহ্নকে সেই বস্তুর লিঙ্গ বলে। বস্তুতঃ যাহাকে মহাদেবের লিঙ্গ বলা হয়, তাহা জ্যোতির্লিঙ্গ, অর্থাৎ হোমাগ্নির লিঙ্গ, অর্থাৎ অগ্নির জ্ঞাপক বা প্রতিমাস্বরূপ। হোমাগ্নি বৈদিক যোনির উপরি বিরাজ করিত; তাহার লিঙ্গ পৌরাণিক যোনির উপরি বিরাজ করিতেছে, এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয়ে মহাভারতের উক্তি আছে, "রুদ্রমগ্নিমুমাং স্বাহাং প্রাহুর্দ্বিজাঃ।" অর্থাৎ, যাহাকে রুদ্র (লিঙ্গরূপী মহাদেব) বলা হয়, তাহা অগ্নি; যাহাকে উমা (যোনিরূপা ভগবতী) বলা হয়, তাহা স্বাহা। স্বাহা অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি, অর্থাৎ দেবতাকে আহ্বান করিবার শক্তি। (মহাভারত, বনপর্ব্ব,—২২৮-৫; ২২৯-২৭)। অ উ ম এই তিন অক্ষর হইতে ওম্, বম্, এবং উমা এই তিন শব্দ সিদ্ধ হয়।

লিঙ্গরূপী মহাদেবকে "গোবৃষধ্বজ" বলা হয়; কিন্তু পূর্ব্বে ঘৃতপ্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যজ্ঞাগ্নিই "গোবৃষধ্বজ"পদের বাচ্য। সুতরাং

লিঙ্গরূপী মহাদেবকে যজ্ঞাগ্নির লিঙ্গ বা প্রতিমা বলিয়া অবধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রায় সকল দেবতারই বাহন আছে, কিন্তু সেই সকল বাহনের পূজা করা হয় না। অতএব বৃষের পূজা মহাদেবের বাহন বলিয়া নহে, কিন্তু গোপূজার ন্যায় অগ্নিচর্য্যার অন্তর্গত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

লিঙ্গ বলিলে পুংলিঙ্গকেও বুঝায়। কিন্তু ভগবানের সেই লিঙ্গ থাকিতে পারে না, অবিচক্ষণ বালকেরাও এই বাক্যের অনুমোদন করিবে। বেদে উক্ত আছে, "ন তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।" (শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা —৩২-৩)। যজ্ঞাগ্নির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতার প্রত্যক্ষ-দর্শনই বেদের আদেশ; অগ্নিত্যাগ করিয়া প্রতিমা পূজা করা পুরাণের ব্যবস্থা।

লিঙ্গমন্দিরে একটি সর্পের প্রতিকৃতিও থাকে; উহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকব্যক্তি সর্পের ত্বক্‌পরিবর্ত্তনের ন্যায় নিজের মর্ত্ত্য শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যদেহ ধারণ করিবে। উহা অগ্নিচর্য্যাদ্বারা মনুষ্যের অমরত্বলাভ করিবার সঙ্কেতস্বরূপ। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণেরও ইহাই মত। তাঁহারা অগ্নিমন্দিরের এইরূপ অভিজ্ঞানরক্ষাপূর্ব্বক লিঙ্গমন্দিরে পরিবর্ত্তিত হওয়াকে Syncretism বলেন। Syncretism is a combination of

two religions in which the forms of the one are preserved with the vocabulary of another, and, perhaps, with some of its features added. (See Robinson: History of Religions, P. 166).

হিংসা। হিংসার হস্ত হইতে কেহই অব্যহতি পায় না। তপঃপরায়ণ বনবাসী নিরীহ মুনিদিগেরও শত্রুপক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলে সুরূপেরা কুরূপদিগের, সুজনেরা দুর্জ্জনদিগের, ধনীরা নির্ধনদিগের এবং উচ্চ-স্থানীয়েরা নীচদিগের হিংসার পাত্র হইয়া থাকে। জীব-দিগের পরস্পর ভক্ষণ ও শত্রুহনন, স্বাভাবিক নিয়ম। ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ আবশ্যক হয় না; বরং যাহাতে ঐ সকল কার্য্য লোপ বা হ্রাস পায়, তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ম্লেচ্ছগণের দেশসমূহে শস্যাদির প্রচুর উৎপত্তি হইত না; সুতরাং জীবিকার নিমিত্ত জীবজন্তুদিগকে বধ করা, এবং শত্রুকে হত্যা করিয়া তাহার সামগ্রী অপহরণ করা, ম্লেচ্ছশাস্ত্রের অনুমোদিত ছিল। হিন্দুগণ ম্লেচ্ছদিগের নিকট হইতেই ঐ সকল আচারব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ ফলমূলশস্যবহুল ও ঘৃতদুগ্ধবহুল দেশ ছিল; এদেশে

দস্যুবধ এবং হিংস্রজন্তুবধ অর্থাৎ মৃগয়া ভিন্ন অন্য কোন-প্রকার জীবহত্যার অনুমোদন ছিল না।

ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বেদ অনুসারে যজ্ঞ "অধ্বর" অর্থাৎ হিংসাশূন্য হওয়া আবশ্যক। ইহাতে যে কেবল জীববলির প্রথা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু মনুষ্য-দিগের পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা ঘটিত সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি শত্রুদ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিনাশ ও নিজ নিজ আত্মরক্ষা কামনা করতঃ দেবতাদ্বয়কে আহ্বান করে, তাহা হইলে সেই দেবতাদ্বয়েরই এক দেবতাকে অপর দেবতার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত করা হয়, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। কারণ, উক্তপ্রকার ক্রিয়ার ফলে এক দেবতা যে মনুষ্যটিকে রক্ষা করিতেছেন অপর দেবতা সেই মনুষ্যটিকেই বিনষ্ট করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছেন। ঐরূপে দেবতাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধভাবের উৎপাদন করিবার ফল হইতেছে এই যে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান উত্তমরূপে করিলেও দেবতারা আর তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসেন না। এই জন্যই বেদে হিংসাবিদ্বেষাদি মনুষ্যের পক্ষে অস্বর্গকর অধর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। "সহৃদয়ং সাংমনস্যম্ অবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ। যেন দেবা ন বিয়ন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ॥" (অথর্ব্ববেদ

—৩-৩০)। ইহাই "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ। অনেকের ধারণা আছে যে, উক্ত বাক্যটি বৌদ্ধশাস্ত্রের বচন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা মহাভারতের বচন। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব—১১-১৩ ; অনুশাসন-পর্ব্ব—১১৫-১ ; ১১-২৫ ; ১১৬-৩৮ ; অশ্বমেধপর্ব্ব—৪৩-২১)।

বেদে দেবতাগণের উদ্দেশে "অজ" বলিদান দিবার কথা আছে। কিন্তু বেদে অজশব্দের অর্থ যাহার জন্ম হয় নাই, যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই আছে ; অর্থাৎ, যবতণ্ডুলাদি বীজ। ঐ অজশব্দই আবার লৌকিক-প্রয়োগে ছাগপশুকে বুঝায়। ইহা হইতেই পশুবলির ভ্রমাত্মক প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে ; এই বার্ত্তা মহা-ভারতে প্রসিদ্ধ আছে। (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব,—৩৩৮ অধ্যায়)।

অনেকে বলেন, বেদে গোবধের বাক্য আছে। কিন্তু সুধীগণ ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে ধাতুপ্রত্যয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা লকারার্থ নির্ণয় করিয়া দেখিবেন যে, ঐ সকল বাক্য বিধিবাক্য নহে, কিন্তু অর্থবাদ, অর্থাৎ ঐতিহাসিক বার্ত্তা মাত্র। অর্থাৎ, সেকালেও অজ্ঞ ব্যক্তিরা গোবধ করিত, এই বার্ত্তা বেদে উক্ত আছে ; কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বেদে কদাচ

বিহিত হয় নাই। "গোঘ্ন" শব্দেরও ব্যুৎপত্তিতে বিধি-প্রত্যয় নাই। গোঘ্ন শব্দের অর্থ, যাহাদিগের নিমিত্ত লোকে গোবধ করে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পণি প্রভৃতি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ, যাহাদিগকে প্রাচীনভারতে "অতিথি" বলা হইত। গোঘ্নশব্দের ব্যুৎপত্তিতে "গাম্ হন্তি তস্মৈ ইতি গোঘ্নঃ অতিথিঃ" (অর্থাৎ পণি প্রভৃতি অতিথিগণের নিমিত্ত লোকে গোবধ করে, কারণ তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, এই হেতু ঐ অতিথিগণকে গোঘ্ন বলে)—এইরূপ বলা হইয়াছে; কিন্তু "গাম্ হন্যাৎ" (অর্থাৎ গোবধ করিবে, করা বিধেয়) এরূপ বলা হয় নাই। ঋষিদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে গোহত্যা করা হইত না। বেদে উক্ত আছে যে, গো-জাতির সৃষ্টি কেবল দেবতার উদ্দেশে হোম সম্পাদনের নিমিত্ত। এই জন্য গব্যঘৃত ও দুগ্ধাদির অগ্রভাগ অগ্নিতে প্রদান না করিয়া ঐ সকল ভোজন করা মনুষ্যের পক্ষে অমঙ্গলজনক ও রোগমূলক বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

গো-সম্বন্ধে বেদে উক্ত আছে, "পিবতূদকম্ তৃণাম্যত্তু। ওম্ উৎসৃজত।" (সামমন্ত্রব্রাহ্মণ, ২-৮-১৪; তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬-১২-১; মন্ত্রপাঠ, ২-১০-১৯)। অর্থাৎ, যে গাভীতে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার গলরজ্জু মোচন

করিয়া তাহাকে ভগবানের নামে উৎসর্গ কর (ছাড়িয়া দাও) সে ইচ্ছামত জলপান করুক ও তৃণ ভক্ষণ করুক। কিন্তু গোহত্যার সমর্থনকারী ব্যক্তিগণ উক্ত বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করে। তাহারা বলে যে, উৎসর্গ কর এই বাক্যের অর্থ যজ্ঞে বলিদান দাও। (জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্র, ১-১৯॥ মহাভারত,—উদ্যোগপর্ব্ব, ১৭-৯; শান্তিপর্ব্ব, ১৬৫-৫২; অনুশাসনপর্ব্ব, ৬৬-৪২)। এইরূপে গোবধের অনুমোদন করিবার তাৎপর্য্য ধনশালী ও প্রতাপশালী গোখাদক বণিক্‌দিগকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যজ্ঞে পশুমেধ করার অনুমোদনকারী ব্যক্তিগণ এই প্রকার বহুবিধ অন্যায় ব্যাখ্যা ও প্রক্ষেপ করিয়া বেদের অবমাননা করিয়াছে। এস্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, মেধ শব্দের প্রকৃত অর্থ বধ নহে কিন্তু পূজা। পিতৃমেধ বলিলে শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি দ্বারা পিতৃগণের পূজা করাকে বুঝায়। মেধ্য শব্দের অর্থ পূজ্য, পবিত্র;—বধ্য নহে।

যজ্ঞে পশুবলির প্রথা থাকা উচিত কি না, এই কথা লইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে এত তীব্র আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে যে, ইদানীং যজ্ঞ বলিলে পশুবলিকেই বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞশব্দের অর্থ দেবযজন মাত্র, উহাতে পশুবলির অর্থ আদৌ ছিল

না। যজ্ঞে জীবহত্যা করিলে সেই নিহতজীব স্বর্গে গমন করে, যদি এই কথা সত্য হয় তাহা হইলে বলিদানের সময়ে যজ্ঞভূমিতে দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ হওয়া অথবা যজ্ঞাগ্নি হইতে দেবতার আদেশ শ্রুতিগোচর হওয়া একান্ত আবশ্যক ; এবং উৎসর্গীকৃত জীবের অন্তঃকরণে দেবতার বলি হইবার ইচ্ছা থাকাও একান্ত আবশ্যক। এই কথা হিন্দুশাস্ত্র ও ম্লেচ্ছশাস্ত্র উভয়েরই অনুমোদিত। (মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব—৬৭-৪ ; বাইবেল, আইজেকের কথা ; কোরাণ, ইস্মায়েলের কথা)।

লোকরক্ষার নিমিত্ত মাংসভক্ষণ, দস্যুবধ, ও যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু ঐ সমূহ হত্যাকাণ্ড রাজনীতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহাতে ধর্ম্মের ভাণ থাকা উচিত নহে। ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, যাহাতে পৃথিবীতে হত্যাকাণ্ডের লোপ হয় তাহারই পথ প্রবর্ত্তিত করা। ইহা সর্ব্বধর্ম্মসম্মত কথা। অগ্নিচর্য্যাই সেই পথ।

যদি বলিদান দেওয়া ধর্ম্মের অঙ্গ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের অন্তঃকরণস্থ "পাপপুরুষ"ই বলিদানের একমাত্র উপযুক্ত বস্তু। এই বলিদানের জন্য কোন স্বতন্ত্র আয়োজন করিতে হয় না। কারণ, বেদে উক্ত আছে যে, অগ্নিদেব স্বীয় উপাসকের অন্তঃকরণস্থ পাপরাশির শোধন

করিয়া মনুষ্যকে দেবতার ন্যায় পবিত্রভাবসম্পন্ন করেন, এইজন্য তাঁহাকে পাবক বলে।

জ্যোতিষ। অনেকের ধারণা, জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের অন্তর্গত। কিন্তু বেদে যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ নহে। সেকালে যজ্ঞের উপযুক্ত ঋতু নির্দ্দেশ করিবার জন্য গণিত-জ্যোতিষের আবশ্যক হইত। ফলিতজ্যোতিষ দ্বারা কর্ম্মের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা হয়; উহা একালের শাস্ত্র, বেদাঙ্গ নহে। গ্রহতারাদর্শন, স্বপ্নদর্শন, অদ্ভুত-দর্শন, করকোষ্ঠী প্রভৃতির দর্শন, যোগবলে দেবতার দর্শন, স্বরোদয়জ্ঞান ইত্যাদিও ফলিতজ্যোতিষের অন্তর্গত। এই জ্যোতিষশাস্ত্রই ইদানীন্তনহিন্দুদিগের ভীরুত্বের ও দাসত্বের মূলকারণ।

পূর্ব্বকালে বৈদিকযুগে কোনপ্রকার অদ্ভুতঘটনার জন্য মানসিক অশান্তির উৎপত্তি হইলে, তাহার শান্তির নিমিত্ত যজ্ঞাগ্নির প্রদক্ষিণ করাই ব্যবস্থা ছিল। (সামবেদীয় অদ্ভুতব্রাহ্মণ; মহাভারত, শল্যপর্ব্ব, ২৩-২৪, ২৫)। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়েও ফলিতজ্যোতিষে বীরপুরুষদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, ইহা মহাভারত হইতে অবগত হওয়া যায়। গীতায় উক্ত আছে যে, অর্জ্জুন যুদ্ধযাত্রা-কালে "দুর্নিমিত্ত"সমূহ দর্শন করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া-

ছিলেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ প্রবৃত্তিকে "ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্ব্বল্য ও ক্লৈব্য" বলিয়া ধিক্কার দেওয়াতে, অর্জ্জুন পুনরায় যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

একালে যজ্ঞাগ্নির সম্পূর্ণ লোপ হওয়ার ফলেই এই বিষময় ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র হিন্দুদিগের আদরের সামগ্রী হইয়াছে এবং তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া হিন্দুগণ ইষ্টপথের ভ্রমে অনিষ্টপথে বারম্বার গমন করিতেছে। যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকা, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থায় সভয় হৃদয়ে অবস্থান করা, সর্ব্ববস্তুতে ও সর্ব্বকর্ম্মে ভয়ের কারণ দর্শন করা, সকলকে ভয় প্রদর্শন করা ও নিজে সামান্য কারণে ভয়বিহ্বল হওয়া,—হিন্দুদিগের এই-প্রকার ভয়ানক দুরবস্থা উৎপাদন করাই ফলিত-জ্যোতিষের একমাত্র ফল। ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, হিন্দুরাজগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতদিগের যুক্তি অনুসারে যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতেন ; কিন্তু সেই সমুদায় যুদ্ধে তাঁহারাই পরাজিত হইতেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিহীন ম্লেচ্ছগণই জয়লাভ করিত। ভীম-সিংহের স্বপ্নদর্শনে বিশ্বাস করিয়া রাজপুতবীরগণ নিরুৎ-সাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহার ফলে ভারতবর্ষের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতের

ইতিহাসে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ এই যে, স্বয়ং ভারতমাতা তাঁহার বীরপুত্রগণকে ভক্ষণ করিয়া ভারতের বীরপত্নীদিগকে ম্লেচ্ছগণের ভোগ্যবস্তু করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। এইপ্রকারস্বপ্নে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা, জতিগতবীর্য্য-হানির পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে; উহা ফলিত-জ্যোতিষ অনুশীলনেরই ফল।

ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, জগতের সমুদায় ঘটনা একনিয়মে পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং সেই নিয়মের তত্ত্ব অবগত হইলে কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহা অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই নিয়মের তত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্যের ক্ষুদ্র শক্তির অতীত; সুতরাং মনুষ্যরচিত ফলিতজ্যোতিষ গ্রাহ্য হইতে পারে না। কোন ব্যক্তির পক্ষে যে দিন জ্যোতিষ অনুসারে অত্যন্ত দুর্দ্দিন, সেই দিনই বাস্তবিক তাহার পক্ষে অত্যন্ত সুদিন; কারণ সেই দিন একমাত্র ভগবান্ তাহার রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং সেই দিন সে ব্যক্তি যাহা করিবে, সেই কার্য্যে তাহার পক্ষে ঈশ্বর সহায় থাকিবেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা কদাচ খণ্ডন করা যায় না; কারণ তাঁহার ইচ্ছা বিশ্বযুক্তিপূর্ণ,—খামখেয়ালি নহে। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা হইবে, এইরূপবিশ্বাসে দৃঢ়নির্ভর করিয়া,

জ্যোতিষশাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্যের সম্পাদন করিবে,—জীবন ও মরণে নিরপেক্ষ হইয়া মনুষ্যের উৎকৃষ্ট কর্ম্মসমূহের সাধনে মনোনিবেশ করিবে। দৈবাৎ ভয় ও অশান্তি উপস্থিত হইলে, যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিবে। অগ্নিচর্য্যা দ্বারা মনকে প্রশান্ত ও অকুতোভয় করিবে। ইহাই নিষ্কামধর্ম্মের সার উপদেশ।

জাতি। বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল এবিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদের যে সকল অংশে জাতিভেদের কথা আছে, সে সকল অংশের ভাষা দেখিয়া বোধ হয় যে, সে সকল পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেকালে যাহারা অগ্নিচর্য্যা করিত, তাহাদিগকে ঋষিগণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমভাবে দৃষ্টি করিতেন; যাহারা অগ্নিচর্য্যার বিরোধী ছিল, তাহাদিগকেই তাঁহারা বিষম-ভাবে দৃষ্টি করিতেন। ইতিহাসপুরাণাদি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে ব্যভিচারাদি-দোষের ফলে অনেক সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সেই সকল জাতির পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ অথবা অস্পৃশ্যতা ছিল না। প্রত্যুত যুদ্ধকালে সকল জাতির লোক সমবেত হইয়া একত্র যুদ্ধ করিত। জাতিবিদ্বেষ ও অস্পৃশ্যতা একালের ধর্ম্ম। মুসলমানদিগের পূর্ব্বকথিত

অত্যাচারের ফলেই হিন্দুদিগের মধ্যে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

হিন্দুসমাজের নীচজাতিদিগের মধ্যে অধিকাংশ জাতি ক্ষত্রিয়বীর্য্যসম্ভূত ও ক্ষাত্রতেজসম্পন্ন। নীচজাতির লোক-দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করা সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা হইলে তাহারাও নিজ নিজ উপযুক্ততা দেখাইতে পারে। নীচজাতির লোকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া, উচ্চনীচের ভেদ লুপ্ত করিয়া দিলে সমাজের অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ বাল্যকাল অবধি অসৎশিক্ষানিবন্ধন নীচজাতির লোকদিগের স্বভাবে পাশবিকপ্রবৃত্তিসমূহ প্রবল হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে হিন্দুদিগের অনুন্নতজাতিসমূহকে যুক্তিপূর্ব্বক উন্নত করিতে হইবে। ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য "শুদ্ধি"র, অর্থাৎ বিধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্মে পুনর্গ্রহণ করিবার, কোনও আবশ্যকতা নাই; প্রত্যুত উহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কারণ, ঐ প্রকারে হিন্দুসমাজের গুপ্তশত্রুগণ হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া সকলের অলক্ষিতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুদিগের অপকার করিতে পারে। হিন্দুদিগের নীচজাতিসমূহকে উন্নত করিতে পারিলে, এবং যাহাতে তাহারা বিধর্ম্মী না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিলে, হিন্দুসমাজের যথেষ্ট

উপকার হইবে। বর্ত্তমানকালের হিন্দুগণ স্বধর্ম্মাবলম্বী-জাতিদিগকে বিধর্ম্মীদিগ অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে; ইহা হিন্দুসমাজের পক্ষে কম নিন্দার কথা নহে।

এক কাশ্মীরদেশীয় পুরুষের মূর্ত্তি এত মনোহর ও রাজপুরুষসদৃশ ছিল যে, ইন্দোরাধিপতি মহারাজ তাহাকে তাঁহার সভাসদ্ করিবার সঙ্কল্প করেন। সেই রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া ঘোর আপত্তি করেন, কারণ সেই ব্যক্তি জাতিতে মেথর ও অস্পৃশ্য ছিল। মহারাজ প্রভূতধনদানপূর্ব্বক তাহার জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আগ্রহের সহিত মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পশ্চাৎ সেই ব্যক্তি রাজসদনে আগমন করিবা-মাত্র, সেই পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণই তাহার যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন, এবং রাজার সহিত একযানে আরোহণ করিতেও অনুমতি দিলেন। অতএব বলিতে হইবে যে, হিন্দুগণ কুক্কুরের ন্যায়, স্বধর্ম্মী অপেক্ষা বিধর্ম্মীকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে।

শূদ্রের মুখে বেদের কথা শুনিতে হইলে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন; অথচ সেই ব্রাহ্মণগণই জার্ম্মণ-পণ্ডিতদিগের কৃত বেদব্যাখ্যা শুনিতে ও তাহা শিরোধার্য্য

করিতে গৌরব বোধ করেন। পরন্তু শূদ্র স্বধর্ম্মী, জার্ম্মণ-পণ্ডিত বিধর্ম্মী। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণগণের মুখাপেক্ষা না করিয়া হিন্দুজাতিমাত্রেরই এখন স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য।

একালে শূদ্রজাতিসমূহের মধ্যে মেথরজাতি অত্যন্ত নীচ ও অস্পৃশ্য বলিয়া সর্ব্বত্র ঘৃণিত হয়। কিন্তু মেথর-শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে কালে ঐ জাতি সমাজে বিশেষরূপে সম্মানিত হইত। মেথর শব্দটি অপভ্রংশ, প্রকৃত শব্দ হইতেছে মহত্তর, অর্থাৎ মাতা অপেক্ষাও মহৎ। কারণ, মাতা কেবল নিজের সন্তানের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন, কিন্তু মেথর-ব্যক্তি সকলেরই মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে।

জাতিসমূহের মধ্যে একতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু-দিগকে আর্য্যাচার গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নিচর্য্যাই প্রধান আর্য্যাচার; উহাতে কেবল হিন্দুজাতির একতা নহে কিন্তু সমগ্র মানবজাতির একতাসূত্র নিহিত আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পুরুষের পক্ষে একপত্নীব্রত হইয়া থাকা এবং নারীর পক্ষে একপতিব্রতা হইয়া থাকা মানবজাতির পরমধর্ম্ম। কিন্তু এই পরমধর্ম্ম পালন করিতে হইলে সমগ্র-মানবসমাজ হইতে জাতিভেদ উঠাইয়া দিতে হইবে। কারণ, কোন একটি জাতির মধ্যে নারীর

সংখ্যা নরের সংখ্যার সমান হয় না, কিন্তু জগতের মানবজাতিসমষ্টির মধ্যে নারীর সংখ্যা প্রায় নরের সংখ্যার সমান হইয়া থাকে। যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে জাতিভেদ রক্ষা করা ধর্ম্মসঙ্গত বা ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না।

উপায়নিরূপণ ও ফলকথন।

সভাসংঘটন, পুস্তিকাবিতরণ, ও প্রচার, এই সকল কার্য্য দ্বারা বেদমার্গের বিস্তার ও. স্বধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিবে; বেদবিস্তার করা মনুষ্যের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদে এবং মহাভারতে উক্ত আছে। (ঋগ্বেদ —৩-১০-৬; মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম,—৩২৭-৪৪)। রাজগণ নিজ নিজ রাজধানীতে এক একটি অগ্নিমন্দির স্থাপিত করিলে, কালক্রমে সমুদায় মন্দির অগ্নিমন্দিরে পরিণত হইতে পারে; কারণ, রাজা যাহা ধার্য্য করেন, প্রজাসমূহ তাহাই কার্য্যে পরিণত করে। গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি তাম্রনির্ম্মিত যোনিযন্ত্রে ঘৃত পূরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত "প্রাতর্দীপন" কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, অগ্নিস্থাপনের নিম্নদেশ যেন শূন্যগর্ভ না হয়। উষ্ণীষ ও কৃপাণ ধারণপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, মনুষ্য তেজস্বী

হয়। গীতায় উক্ত আছে যে, যদি কেহ নিষ্কামভাবে, অর্থাৎ ফলাফলের জন্য উৎসুক না হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া, স্বধর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। (ভগবদ্‌গীতা—২-৪০)।

তেজস্বিনী সতীমাতাগণই স্বধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রধান উপায়। তাঁহাদের সাহায্যেই হিন্দুগণ দারুণ ম্লেচ্ছদিগের কবল হইতে স্বধর্ম্মকে অদ্যাবধি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুরাকালেও তাঁহাদেরই হস্তে ধর্ম্মরক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত। সেকালে বিধবাগণকে গোমতী বলা হইত; কারণ, তাহারাই গোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্য্যা প্রভৃতি করিত। কুমারীগণকে দুহিতা বলা হইত; কারণ, তাহারাই গোসমূহের দুগ্ধ দোহন করিত। সধবাগণকে ঘৃতহস্তা বলা হইত; কারণ, তাহারাই দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিয়া হোমকর্ম্মের নিষ্পাদন করিত। একালে পুনরায় উক্তপ্রকার নারী-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইলে, স্বধর্ম্মেরও পুনঃপ্রবর্ত্তন স্বতই সম্পন্ন হইবে। "প্রাতর্দীপন" কর্ম্ম নারীগণেরই জন্য সুবিহিত হইয়াছে।

অতঃপর এই ধর্ম্মের ফল কথিত হইতেছে। মর্ত্ত্য-লোক মর্ত্ত্যই থাকিবে, কখনই তাহা স্বর্গে পরিণত

হইবে না। কিন্তু মর্ত্ত্যলোকবাসিগণ স্বর্গের পথ দেখিতে পাইবে, এবং স্বর্গের নিয়ম অনুসারে মর্ত্ত্যলোকের শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহা মনুষ্যজাতির পক্ষে কম লাভের কথা নহে। মৃত্যুর পরে পরলোক আছে এবং ইহলোকে ধর্ম্মপথে থাকিলে পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারা যায়, এই বার্ত্তা জ্ঞাত হইলে মনুষ্যগণ স্বতই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হইবে, এবং সমুদয় ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মানসিক বলে বলীয়ান্ হইবে। এই প্রকারে হিন্দুদিগের লুপ্তপ্রায় তেজস্বিতার ও ক্ষাত্রধর্ম্মের পুনরুদ্ভব হইবে। গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন হইবে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতবস্তুসমূহ সুলভ হইবে, এবং তাহার ফলে সমুদায় বস্তুর দুর্ম্মূল্যতার হ্রাস হইবে। স্বাস্থ্য ও বলের আবির্ভাব হইবে। বেদবিদ্যা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সতীধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইবে। পৌরাণিকধর্ম্মের লোপ হইবে, এবং তাহার ফলে তীর্থযাত্রা ও উৎসবাদিঘটিত অর্থব্যয়ের সঙ্কোচ হইয়া গোরক্ষার অনুকূলে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত হইবে। হিন্দুজাতির মধ্যে যে সকল পরস্পরবিরুদ্ধ সম্প্রদায় আছে, সে সকল একতাসূত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। অন্যান্য জাতির ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের সহযোগ সম্ভব হইবে; কারণ, সকল জাতির ধর্ম্মের মূলে হয় অগ্নিযজন, না হয় দেবতাসমাগম বর্ত্তমান আছে। কালক্রমে

দেবতাগণের মর্ত্ত্যে আগমন এবং মর্ত্ত্যগণের দেবলোকে গমনও কদাচিৎ সংঘটিত হইতে পারে, এ বিষয়ে স্বয়ং বেদই প্রমাণ। দেবতাগণের আগমনে মনুষ্যজাতির পশুভাব তিরোহিত হইয়া দিব্যভাব বিকশিত হইবে। অপিচ, পশুপক্ষী জীবজন্তু সকলেই পরমসুখের ভাগী হইবে। সকলজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

দেবজাতি ও মনুষ্যজাতি এই দুইটির পরস্পরের মধ্যে স্ত্রীপুরুষঘটিত সম্বন্ধ হইতে পারে, ইহা পুরাণের কথা। অহল্যার গল্প ইহার একটি দৃষ্টান্ত। পরন্তু এই কথা বেদসম্মত নহে। দেবতাবিষয়ে বেদই প্রমাণ, পুরাণ প্রমাণ নহে; সুতরাং বেদের মতই সত্য বলিয়া ধার্য্য। দর্শনশাস্ত্রের যুক্তি দ্বারাও বেদেরই মত সমর্থিত হয়, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে।

পঞ্চপ্রকৃতি দর্শন।

সৃষ্টির বস্তুসমূহের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে প্রকৃতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাহা যথাক্রমে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রথম প্রকৃতি, সুষুপ্তি। এই প্রকৃতির বস্তুসকল সর্ব্বদা গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকে; যথা, প্রস্তরাদি জড়পদার্থ। জড়পদার্থসমূহ অচেতন নহে; উহাদিগের মধ্যে চৈতন্যের সমাবেশ আছে, প্রাচীন ঋষিগণ ইহা বিশদভাবে বলিয়া গিয়াছেন। (নৃসিংহতাপিনী উপ-

নিষদের উত্তরতাপিনী, ৯-১)। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই কোন না কোনরূপে চৈতন্য আছে।

দ্বিতীয় প্রকৃতি, স্বপ্ন। এই প্রকৃতির বস্তুসমূহ প্রবুদ্ধ কিন্তু ইন্দ্রিয়শূন্য, সেই জন্য উহারা সর্ব্বদা স্বপ্নবৎ অবস্থায় থাকে; যথা, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্। ইহাদের সুখদুঃখের অনুভবকালে কারণজ্ঞান হয় না।

তৃতীয় প্রকৃতি, স্বপ্নজাগ্রৎ। এই প্রকৃতির বস্তু-সমূহ ইন্দ্রিয়বান্; তাহারা ইন্দ্রিয়ের উন্মেলনে জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, এবং ইন্দ্রিয়ের নিমেলনে স্বপ্ন অবস্থায় থাকে; যথা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, কীটপতঙ্গাদি জীব-জন্তুগণ।

চতুর্থ প্রকৃতি, অচিরজাগ্রৎ। এই প্রকৃতির বস্তু-সকল সর্ব্বদা জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, কিন্তু তাহাদের সেই অবস্থা চিরকাল থাকে না, একদিন না একদিন তাহাদের সেই অবস্থার শেষ হইয়া যায়, এবং তখন তাহারা পুনরায় তৃতীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; যথা, প্রেতগণ, পিতৃগণ। ইহারা কেবল মনন দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য করিতে পারে।

পঞ্চম প্রকৃতি, চিরজাগ্রৎ। এই প্রকৃতির বস্তু-সকল সর্ব্বদা জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে এবং তাহাদের সেই অবস্থা চিরকাল থাকে, কখনও শেষ হয় না; যথা, দেবতা-

দিগের গণসমূহ। ইহারা জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দময় ও জরা-মরণরহিত।

ইহাই পঞ্চপ্রকৃতিদর্শন। ইহার ঊর্দ্ধে ঋষিগণ আর দর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকল প্রকৃতির আদি-কারণ, সুতরাং তাহা সকলপ্রকৃতির অতীত এবং তাহা দর্শনের বস্তু নহে।

অমৃতসিদ্ধি।

কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, স্বর্গলোকও অনিত্য, সেখানেও কালের গতি বর্ত্তমান আছে, অনন্তকালের স্রোতে একদিন স্বর্গলোকও শেষ হইয়া যাইবে; অতএব দেবতারাও প্রকৃতপক্ষে অমর নহেন। এক্ষণে এই মতের ভ্রান্তি প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকৃতির প্রত্যেকটিতেই জগতের অনুভব বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, এবং তৎসহিত কাল ও আকাশের অনুভবও পরিবর্ত্তন করে। স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই উভয়ের তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, অবস্থাভেদে অনুভবেরও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। স্বপ্নে মনুষ্য নিজের মুখ, পৃষ্ঠদেশ অথবা ছিন্নমুণ্ড স্বচক্ষে

দেখিয়া থাকে; জাগ্রৎ অবস্থায় কদাচ ঐসকল সম্ভব হয় না। স্বপ্নে মনুষ্য নিজদেহকে পতঙ্গদেহে অথবা পশুদেহে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পায়, এবং তখন তৎতৎ দেহধারীর ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকে। স্বপ্নে মৃত-ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করে, এবং তাহা করা কোন আশ্চর্য্য মনে করে না; স্বপ্নে এক মাসের পথ এক মুহূর্ত্তে গমন করে, এবং তাহা করা অসম্ভব মনে করে না। স্বপ্নে মনুষ্য এক নিমেষকে এক যুগের ন্যায় অতিবাহিত করে, এবং এক যুগকে এক নিমেষের মধ্যে সমাপ্ত করে। এইপ্রকার অবস্থাভেদে কালবোধের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। যোগ-বাসিষ্ঠগ্রন্থে ইহার বহুতঃ উদাহরণ আছে। পঞ্চমপ্রকৃতিতে উপনীত হইলে, কাল আকাশের ন্যায় মহান্ ও অচল বিস্তার বলিয়া বোধ হয়; তখন কালের গতি বা স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন সেই স্থির মহাকালের মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান একত্র দেখিতে পাওয়া যায়; উহাকে অস্থিরবস্তুসমূহের একমাত্র স্থির আধার বলিয়া জ্ঞান হয়। যখন কালের গতিশীলতা স্থিরতায় পরিণত হয়, তখন তৎসহিত জীবনের অনিত্যতাও নিত্যতায় পরিণত হয়, ইহা বোধগম্য করা কঠিন

নহে। তখন আর মৃত্যুর কোন কথাই উঠিতে পারে না। ইহাই দেবতাগণের অমৃতসিদ্ধি বা অমরত্ব লাভ।

স্বর্গলোকেও দেবতাগণের উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে গমন হয়, এইরূপ কথা প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং কাহারও মনে সংশয় হইতে পারে যে, উচ্চতর শ্রেণীতে গমন করিবার সময়ে, দেবতারও দেহত্যাগ এবং মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সংশয়ের সমাধান করা যাইতেছে। দেহত্যাগের সময়ে জাগ্রদ্‌ভাব বিনষ্ট হইয়া স্বপ্ন বা সুষুপ্তি উপস্থিত হইলেই তাহাকে মৃত্যু বলা হয়; নচেৎ জাগ্রদ্‌-ভাব বিনষ্ট না হইয়া কেবল দেহপরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহা কদাচ মৃত্যুপদবাচ্য হইতে পারে না। দেবতাদের চিরজাগ্রৎ অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের দেহপরিবর্ত্তন ঘটিলে, উহা তাঁহাদের জাগ্রৎ অবস্থাতেই ঘটে; উহাকে মৃত্যু বলা যাইতে পারে না।

অনেকের ধারণা যে সূর্য্যলোকেই স্বর্গলোক অবস্থিত। ইহা তাহাদের ভ্রান্তি। সূর্য্যলোক অনিত্য, স্বর্গলোক নিত্য। স্বর্গলোক পরিদৃশ্যমান জগতের বহির্ভূত। দেবতাগণ এই পরিদৃশ্যমান জগতে আবির্ভূত হইবার সময়ে প্রথমে সূর্য্যলোকে আবির্ভূত হন, পশ্চাৎ পৃথিবীতে যজ্ঞাগ্নিতে প্রকট হন। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, পার্থিব যজ্ঞাগ্নি, মধ্যমাগ্নি বিদ্যুতের সহিত সংযুক্ত হইয়া,

সৌর অগ্নির রশ্মিতে সম্বদ্ধ হয়; এবং তাহারই ফলে দেবতাগণ মর্ত্ত্যলোকে আকৃষ্ট হন।

বেদবাক্যসমূহের প্রসঙ্গ ও পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ অবলোকন না করিয়াই অনেকে বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করেন; তাঁহারা বলেন যে, বেদে উক্ত আছে স্বর্গের ক্ষয় হয়, সুতরাং মুক্তির জন্য চেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহাদের এই কথা যথার্থ নহে। বেদে কর্ম্মপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কেবল কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য চিরলোক লাভ করিতে পারে না, অচিরলোকে গমনপূর্ব্বক পশ্চাৎ মর্ত্ত্যলোকে পুনরাবর্ত্তন করে; এবং জ্ঞানপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানব্যতীত কদাচ কেহ চিরলোক লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া, কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকিতে হইবে, এইপ্রকার কথা বেদে নাই। বস্তুতঃ বেদসমূহের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল জ্ঞানদ্বারা বা কেবল কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য অমৃতসিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানের সহিত তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করিলেই মনুষ্য অমৃতসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। এই কথা ঈশোপনিষদে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে। উপনিষদের মহাবাক্যসমূহ হইতে মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়; ঐ মহাবাক্যসমূহকে "সার্দ্ধান্তিক" বলা হয়,—তাহার অর্থ এই যে, মন্ত্রপাঠের বিরামকালে

মহাবাক্য পাঠ করিতে হয়; বেদের মন্ত্রসমূহের পাঠ হইতে দেবকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। এইপ্রকারে দেবযজন ও জ্ঞানোপার্জ্জন একসহিত করিতে পারিলে মনুষ্য অমৃত-সিদ্ধি লাভ করিবার উপযুক্ত হয়। দেবযজনত্যাগপূর্ব্বক কেবল জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায়, ইহা সন্ন্যাসী-দিগের উদ্ভাবিত নবীন মত। উহা বেদসম্মত নহে; কারণ, উহা মনুষ্যের সাধ্য নহে। মনুষ্যকে আপাততঃ স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেবতা হইতে হইবে; পশ্চাৎ তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সে স্বর্গলোকে অবস্থানকালে অবগত হইবে। যাহারা মনে করে যে স্বর্গের পর আর কিছুই নাই, তাহারা ভ্রান্ত; এই হেতু ভগবদ্গীতায় "নান্যদস্তিবাদী স্বর্গপর" ব্যক্তিদিগকে ও তাহাদের "ত্রৈগুণ্যবিষয়ক ক্রিয়াবহুল বেদবাদ" সমূহকে নিন্দা করা হইয়াছে। (গীতা—২—৪২ হইতে ৪৪)। মনুষ্যকে প্রথমতঃ স্বর্গে অবস্থান করিতে হইবে; কারণ স্বর্গে অবস্থান করিতে পারিলে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করা সম্ভব হইবে। যাবৎ স্বর্গলোক প্রাপ্তি না ঘটিবে, তাবৎ মনুষ্যকে মর্ত্ত্যলোকে বারম্বার "পুনর্জ্জন্ম" গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই বেদ এবং সনাতনধর্ম্ম,—মানব-জাতির স্বধর্ম্ম।

অহল্যা উপাখ্যানের মিথ্যাত্ব।

এই পরিচ্ছেদে যাহা বলা হইল, মূলপ্রবন্ধের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, অনেকে এইপ্রকার মনে করিতে পারেন। সেই হেতু উপসংহারে দেখান যাইতেছে যে পঞ্চপ্রকৃতিদর্শন দ্বারা অহল্যা-উপাখ্যানের সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা যায়।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি প্রকৃতির বিকাশের বিষয়ে পরস্পর ক্রমান্বয় থাকিলেও,. উহাদের সংমিশ্রণের বিষয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধতা আছে। এক প্রকৃতির বস্তুনিচয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুসমূহের সংমিশ্রণ হয় না। এই যুক্তি অনুসারে অহল্যার উপাখ্যান কদাচ সত্য হইতে পারে না। ইন্দ্র পঞ্চম প্রকৃতির এবং অহল্যা তৃতীয় প্রকৃতির বস্তু। এই উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে পারে না। অধিকন্তু, দেবশরীর অগ্নিময়; উহাতে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, স্বেদ, শুক্র, শোণিত প্রভৃতি নাই; উহা মাতাপিতৃসম্ভূত নহে; সদ্ধর্ম্মপালনের প্রভাবে মনুষ্যের মৃত্যুর পরে তাহার সূক্ষ্মশরীরই ঐ ভাব প্রাপ্ত হয়। (মহাভারত, বনপর্ব্ব,—২৬১-১৩)। সেই অগ্নিময় শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শরীর ধারণ করা দেবতাগণের সাধ্য নহে;— উহা একটি

কাল্পনিক কথা মাত্র। সুতরাং মনুষ্যজাতির সহিত দেব-জাতির রতিক্রীড়া সম্ভবপর নহে। দেবতারা দৃষ্টিদ্বারা ভোগ করেন, এই কথা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ; তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যের ন্যায় স্ত্রীসহবাস নাই। দেবদেবীর নিত্য-সহচরত্বই তাঁহাদের সহবাস। মনুষ্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীপুরুষের রতিক্রীড়া তাহাদের পশুভাব বলিয়া ঘৃণিত হয়, এবং পতিপত্নীর ধর্ম্মকর্ম্মে সহচরত্ব তাহাদের দেবভাব বলিয়া পূজিত হয়। যখন দেবগণ দেবীদিগের সহিত রতিক্রীড়া করেন না, তখন তাঁহারা মানুষীদিগের সহিত কিপ্রকারে তাহা করিতে পারেন?

অহল্যার উপাখ্যান মিথ্যা। যেকালে ঐপ্রকার উপাখ্যানসমূহ রচনা ও প্রচলন করা আবশ্যক হইয়াছিল, সে কাল এখন আর নাই। একালে ঐ সমূহ উপাখ্যান হইতে সমাজের উপকার না হইয়া ভূরি ভূরি অপকার হইতেছে। দেবতাগণের চরিত্র নির্ম্মল, সেই হেতু নির্ম্মল-চরিত্র ব্যক্তিকে লোকে দেবচরিত্র বলিয়া থাকে। মনুষ্য দেবচরিত্র হইয়া দেবতার উপাসনায় রত থাকিবে, তাহা হইলেই উপাসনার সুফল লাভ করিতে পারিবে; ইহাই বেদ ও শাস্ত্রসমূহের অভিপ্রায়, এবং ইহাই হিন্দুজাতির ও হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশামোচনের একমাত্র উপায়।

পরিপৃচ্ছা।

পূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল এখন তাহার উপরি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

(১) জড়ের উপর বনস্পতি, বনস্পতির উপর জীবজন্তু, জীবজন্তুর উপর মনুষ্য; এইপ্রকার ক্রমোন্নতি হওয়া সৃষ্টির নিয়ম নহে কি?

(২) তাহা হইলে, মনুষ্যের একবারে নির্ব্বাণ না হইয়া অগ্রে অন্য কোন উন্নত অবস্থায় পরিণতি হওয়াই সৃষ্টির উদ্দেশ্য নহে কি?

(৩) দেবতাগণই মনুষ্যের পরমপরিণতি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে কি?

(৪) দেবতা হইয়া স্বর্গসুখভোগ করিবার ইচ্ছা মনুষ্যের স্বধর্ম্ম নহে কি?

(৫) পরমেশ্বরতত্ত্ব মনুষ্যের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অতীত নহে কি?

(৬) পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মই দেবতাসমাগম হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে হিন্দুর স্বধর্ম্ম ও মনুষ্য-জাতির স্বধর্ম্ম এক বলা যাইতে পারে না কি?

(৭) তাহা হইলে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রকেই স্বধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য নহে কি?

(৮) সত্যের সহিত মিথ্যার বিবাদে পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে, ইহা অবগত হইয়া প্রতিমাপূজা, জ্যোতিষচর্চ্চা প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ সাক্ষাৎ দেবতাদর্শনের পথ অবলম্বন করাই স্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা নহে কি ?

(৯) জীববলি, বিদ্বেষণ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ক্রূরকর্ম্ম-সমূহকে স্বধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা অনুচিত নহে কি ?

(১০) গৃহে গৃহে পৌরহিত্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করা ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্মপালনের পক্ষে হানিকর নহে কি ?

(১১) সতীমাতাদিগের হস্তে স্বধর্ম্মরক্ষার ভার ন্যস্ত রাখিবার এবং বিধবা নারীদিগকে দিবারাত্র স্বধর্ম্মচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য নহে কি ?

(১২) যাহাতে অসৎ ও অসতী জনগণ দুষ্টবীজের বিস্তার করিয়া স্বধর্ম্মকে বিনষ্ট করিবার উপায় করিতে না পারে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সমাজের কর্ত্তব্য নহে কি ?

(১৩) বলপূর্ব্বক নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করার অপরাধে দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বধদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত নহে কি ?

(১৪) স্বধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীপুরুষদিগকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য বলপ্রাপ্তিহেতু অসি ও কৃপাণ ধারণ করিতে দেওয়া উচিত নহে কি ?

অহল্যা উপাখ্যান।

(১৫) নিম্নশ্রেণীর লোকগণ স্বভাবতঃ পশুপ্রকৃতি ও পাপবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা অবগত হইয়া সমাজে উচ্চনীচের ভেদ রক্ষা করা এবং উচ্চকর্ত্তৃক নীচের শাসন রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে কি ?

(১৬) সমগ্রমানবজাতির মধ্যে একতাস্থাপনের জন্য, এবং একপত্নীব্রত ও একপতিব্রতাধর্ম্মের প্রবর্ত্তনের জন্য, এবং সন্তানসন্ততির উৎকর্ষসাধনের জন্য, পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে পরস্পর বিবাহবন্ধনের প্রচলন হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে কি ?

পরিশিষ্ট।

ভবিষ্যদ্বাণী।

অহল্যার উপাখ্যানে হিন্দুজাতির জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী রূপকচ্ছলে নিহিত আছে। অহল্যা রূপে ও গুণে সকলের লোভের বস্তু; তাহাই হইতেছে ভারতমাতা। ইন্দ্র বজ্রধারী শক্তিশালী দেবরাজ; তাহা হইতেছে বিদ্যুৎবিদ্যানিপুণ রাজশক্তিসম্পন্ন দিব্যদেহপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র একপত্নীব্রতধারী, বেদধর্ম্মাবলম্বী, দেবচরিত্রসম্পন্ন, ভারতমাতার সুসন্তান; তাহা হইতেছে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চরিত্রবান্ হিন্দুব্যক্তি। অহল্যা ইন্দ্রের আগমনে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পতিতা হইয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে তাঁহার পুনরুদ্ধার হইল। অর্থাৎ, ভারতবর্ষ কালক্রমে বিদ্যুৎবিদ্যানিপুণ ব্যক্তির আগমনে অধঃপাতে যাইবে; পশ্চাৎ হিন্দুগণের মধ্যে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার আবির্ভাব হইলে, তাহার পুণ্যস্পর্শে ভারতবর্ষের জড়ত্ব এবং মোহান্ধকার তিরোহিত হইবে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ।

শব্দসূচী।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

(থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য)।

গৌড়পাদীয়কারিকাসহিত দশাঙ্গদুর্গাসপ্তশতী। (সংস্কৃত)।

অগ্নিচক্রপ্রবর্ত্তনসূত্রম্। (সংস্কৃত)।

Buddha-Mimansa. (বুদ্ধমীমাংসা—ইংরাজী ও সংস্কৃত)।

The Universal Religion. (সর্ব্ববাদিসম্মতধর্ম্ম—ইংরাজী)।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও ছাপা হয় নাই :—

স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ঋগ্বেদসংহিতা।

ঈশোপনিষদের আগ্নেয়ভাষ্য।

মোহমুদ্গরের বিস্তৃত ব্যাখ্যা।

পঞ্চমবেদ নামক টীকা সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।